যেমন ছিলেন সালফে সালিহগণ

খ্যাতনামা শায়েখ ও আলেম

খালিদ আবদুর রহমান আল-হুসাইনান

(রহিমাহুল্লাহ)

যেমন ছিলেন সালফে সালিহগণ

খ্যাতনামা শায়খ ও আলেম
খালিদ আব্দুর রহমান আল-হুসাইনান
(রহিমাহুল্লাহ)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। অজস্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা:, তার সাহাবীগণ ও তার পরিবারবর্গের উপর। আম্মাবাদ:

সালিহীন, আবিদীন ও আলেমে রাব্বানীদের অবস্থা, ঘটনাবলী ও জীবন চরিত জানা এই যামানায় আমাদের বড় প্রয়োজন। কারণ তাদের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, তাদের ঘটনাবলী জানা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাঝে অনেক উপকারীতা রয়েছে। যেমন:

১. এই সকল মহাপুরুষগণ যে স্তরে পৌঁছেছেন, সে স্তরে পৌঁছার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা এবং মনোবল সতেজ করা।

২. নিজের ক্রুটি ও হীনতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

৩. অন্তর ও বিবেককে সেই উন্নত চরিত্র, মহৎ গুণাবলী ও অনুপম ইবাদতের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করানো, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যার থেকে ব্যাপক উদাস হয়ে পড়েছি।

তাই আমি পাঠকদের সামনে এই আলোচনাটি নিয়ে হাজির হলাম, যাতে শুধু সংকলন, সংক্ষেপণ, পরিমার্জন ও বিন্যাস ব্যতীত আমার কোন কাজ নেই। সবটাই আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম ও মুজতাহিদদের বাণী ও উক্তিসমগ্র থেকে সংকলন করেছি। আল্লাহ তাদের প্রতি ভরপুর রহমত বর্ষণ করুন আর আমাদের ও তাদের সকলকে তার সুবিস্তৃত জান্নাতে ও সন্তুষ্টিময় স্থানে আবাস দান করুন। তিনিই একমাত্র আশ্রয় এবং ভরসা তারই উপর।

আমি এ বিষয়টি সংকলন করেছি যাতে এটা আমার জন্য নেককারদের গুণাবলী ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে সহায়ক হয় আর দায়ী, খতীব ও মসজিদের ইমামগণসহ সকল মানুষ এর থেকে উপকৃত হয়।

فاعبده واصطبر لعبادته

অতএব তারই ইবাদত কর এবং তারই ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখ

- ইমাম সা’দী রহ: বলেন: অর্থাৎ নিজেকে তাতে আবদ্ধ রাখ, তাতে পরিশ্রম কর এবং তোমার সাধ্যমত পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে তা পালন কর। আর একজন আবেদের জন্য আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকা যেকোন সম্পর্ক ও যেকোন কামনা বাসনা থেকে অধিক আরামদায়ক ও শান্তিদায়ক।
- সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল: বান্দার অন্তর ইবাদতের আগ্রহে পরিপূর্ণ থাকা। এভাবে যখন অন্তর ইবাদতের আগ্রহে পরিপূর্ণ থাকবে, তখন অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আমল করতে থাকবে। ফলে কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদত করতে থাকবে, কিন্তু অন্তর নিস্কর্ম থাকবে।
- যে ইবাদতগুলোতে সালফে সালিহীনের অনেকে উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন:
  - আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতে উদাসীনতা প্রদর্শন করো। তা হচ্ছে ‘তাওয়াযু’ (বিনয়)।
  - হাসান বসরী রহ: বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হল, মধ্য রাতে নামায পড়া। তিনি আরও বলেন: এটা বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্যলাভের সবচেয়ে সহজ পথ। অত:পর তিনি বলেন: আমি এর চেয়ে কঠিন ইবাদত আর কিছু দেখিনি।
  - ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ: বলেন: সর্বোত্তম ইবাদত হল, ফরজসমূহ আদায় করা, হারামসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।
  - ইবনুস সাম্মাক তার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে লিখেন: সর্বোত্তম ইবাদত হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করা। আর সর্বনিকৃষ্ট লোভ হল আখিরাতের কাজের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করা।

জনৈক বুযুর্গ বলেন: মূল ইবাদত হল: তুমি আল্লাহ ব্যতিত কারো কাছে চাইবে না।

* কিভাবে আল্লাহর দিকে এগুবে? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: বান্দা কষ্ট সহ্য করা ও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে এগুতে থাকে।

* আল্লাহ থেকে লজ্জা করা: বান্দা আল্লাহ থেকে লজ্জা করবে যেভাবে: ভয় ও বিনয়হীন নামায নিয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে লজ্জা করবে। ফলে আল্লাহ থেকে লজ্জার অনুভূতি একজন মুসলিমকে ভালোভাবে ইবাদত করতে এবং এমন বিনয়ী নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে উদ্ধুদ্ধ করে, যাতে ভয় ও শংকার তাৎপর্য বিদ্যমান থাকবে।

* তুমি কিভাবে নিজের মাঝে আল্লাহর নৈকট্য উপলব্ধি করতে পারবে? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: আল্লাহর নৈকট্যের পরিমাণ অনুযায়ী বান্দার ইবাদতে ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়।

* ফকীহ কে! ইমাম আওযায়ী রহ: বলেন: আমাকে জানানো হল, এটা কথিত আছে যে: ধ্বংস সে সকল ফকীহদের জন্য, যারা ইবাদত সঠিকভাবে করে না আর সন্দেহ-সংশয় দ্বারা হারামকে হালাল করে।

- জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন: তাকওয়াহীন ফকীহ এমন প্রদীপের ন্যায়, যা ঘর আলোকিত করে, কিন্তু নিজেকে দগ্ধ করে।

- ইমাম শা'বী রহ: বলেন: আমরা আলেম বা ফকীহ নই। আমরা হলাম এমন কিছু লোক, যারা একটি হাদিস শ্রবণ করেছি, অত:পর তা তোমাদের নিকট বর্ণনা করছি। আমরা শুনেছি: ফকীহ হল সে, যে আল্লাহর হারামসমূহ থেকে বেঁচে থাকে। আর আলিম হল সে, যে মহান আল্লাহকে ভয় করে।

- কখন ইবাদতের স্বাদ লাভ করবে:
    - বিশর ইবনুল হারিছ বলেন: তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের স্বাদ লাভ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাঝে ও কামনা বাসনার মাঝে একটি লোহার দেয়াল তৈরী না হবে ।

- ইয়াহইয়া ইবনে মাআয বলেন: দেহের অসুস্থতা ক্ষুধার কারণে আর অন্তরের অসুস্থতা গুনাহের কারণে। তাই যেমনিভাবে দেহ অসুস্থাতার সময় খাবার স্বাদ পায় না, তেমনিভাবে অন্তর গুনাহের সাথে ইবাদতের স্বাদ পায় না।
- ওহাইব ইবনুল ওয়ারদ কে বলা হল: যে গুনাহ করে সে কি ইবাদতের স্বাদ পায়? তিনি বললেন: না, এমনকি যে গুনাহের ইচ্ছা করে সেও না।

- আমাদের উপর আল্লাহর হক কি?

  আমাদের উপর আল্লাহর হক হল আমরা তারই ইবাদত করবো, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং সামান্য ইবাদতও মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করবো না। কারণ যে সত্ত্বা সকল প্রকার ইবাদতের হকদার, তিনি হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা। একত্ব শুধু তারই, আনুগত্য শুধু তারই, জবাই ও মান্নত শুধু তারই নামে হবে, কসম শুধু তারই নামে হবে, তাওয়াফ কেবল তার ঘরকেই করতে হবে, শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র তারই অধিকার। কারণ একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

- হাসান বসরী রহ: মসজিদে প্রবেশ করে একটি মজলিসের পাশে বসলেন, যেখানে কথা চলছিল। তিনি তাদের কথা শোনার জন্য চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন: এই লোকগুলো ইবাদতে বিরক্ত হয়ে গেছে আর কথাবার্তা তাদের নিকট আরামাদায়ক হয়ে গেছে। তাদের খোদাভীতি কমে যাওয়ার কারণে তারা কথাবার্তা বলছে।
- ইবাদতের প্রাণ হল: আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি ও তার প্রতি ভালবাসা। যখন দু'টির একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়।
- কেন আমরা ইবাদত থেকে বঞ্চিত হই:
  - ফুযাইল ইবনে ইয়ায বলেন: যখন তুমি রাত্রি জাগরণ ও দিবসে রোযা পালন করতে পারবে না, তখন মনে করো, তুমি বঞ্চিত, বন্দী; তোমার গুনাহ তোমাকে বন্দী করে রেখেছে।

- আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন: কারো গুনাহের কারণেই তার জামাতে নামায ছুটে যায়।
- জনৈক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনে আদহামকে বলল: আমি রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে পারি না, তাই আমার জন্য একটি চিকিৎসা বলুন। তিনি বললেন: তুমি দ্বীনের বেলা তার অবাধ্যতা করবে না। তাহলে তিনিই তোমাকে রাত্রি বেলা তার সামনে দাঁড় করাবেন। কারণ রাত্রি বেলা তার সামনে দন্ডায়মান হওয়া একটি মহা মর্যাদাকর বিষয়। আর গুনাহগার এই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

- কিভাবে তা ছেড়ে দিলো? আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন: ঐ ব্যক্তির বিষয়টি আশ্চর্যের নয়, যে এখনো ইবাদতের স্বাদ পায়নি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যে ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার পরও তা ছেড়ে দিল। সে কিভাবে এখন তা না পেয়েও সবর করতে পারে?!

খোদাভীতি

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

“আর যে স্বীয় রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং মনকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাতই তার ঠিকানা।”

ইমাম তাবারী রহ: বলেন: অর্থাৎ আর যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দ-ায়মান হওয়ার সময় আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হওয়াকে ভয় করে, ফলে তার ফরজগুলো আদায় করা ও তার গুনাহগুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাকে ভয় করে চলে।

(وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) অর্থাৎ যে বিষয় আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, এমন বিষয়ের কামনা বাসনা থেকে স্বীয় মনকে বাঁধা দেয়, সতর্ক করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে আল্লাহ আদেশের দিকে চলে।

- খোদাভীতির প্রকৃত অর্থ: হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা।
- ইবনুল কায়্যিম রহ: খোদাভীতির সংজ্ঞা দেন এভাবে: যার কারণে পরকালের ক্ষতির আশংকা থাকে তা বর্জন করা।
- নবী কারীম সা: এর খোদাভীতি: আনাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সা: একটি পতিত খেজুরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। খেজুরটি দেখে তিনি বললেন: যদি এটা সদকার খেজুর না হত, তাহলে আমি অবশ্যই এটা খেতাম। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)
- কিভাবে কারো খোদাভীতি বুঝতে পারবে? ইউনুস ইবনে উবায়দ বলেন: একজন লোক কথা বললে, তুমি তার কথার দ্বারা তার খোদাভীতি বুঝতে পারবে।
- সবচেয়ে কঠিন আমল: বিশর ইবনুল হারিছ বলেন: সর্বাধিক কঠিন আমল তিনটি: স্বল্পতার মধ্যেও দান করা, নিভৃতে আল্লাহকে ভয় করা এবং এমন ব্যক্তির নিকট হক কথা বলা, যার থেকে আশংকা ও আশা করা হয়।
- ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন: ইলম তিনটি জিনিসের নাম:
    ১. এমন খোদাভীতি, যা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে।
    ২. এমন চরিত্র, যার মাধ্যমে সে মানুষের সাথে কোমল আচরণ করে।
    ৩. এমন সহনশীলতা, যার মাধ্যমে সে অজ্ঞদের অজ্ঞতার জবাব দেয়।
- খোদাভীতির একটি নমুনা: এই উম্মাহর পূর্বসূরীদের জীবনীতে হারাম কাজে পড়ে যাওয়ার আশংকা সংক্রান্ত অনেক খোদাভীতির ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ: এর একটি ঘটনা: তিনি ‘মার্ভ’ থেকে

শামে ফিরে আসেন একটি কলম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, যেটা তার জনৈক সাথী থেকে তিনি ধার নিয়েছলেন।

- গভীর খোদাভীতি: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুরাব্বা বলেন: আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট ছিলাম। তার নিকট একটি দোওয়াত ছিল। ইত্যবসরে আবু আব্দুল্লাহ একটি হাদিস বর্ণনা করলে আমি তার নিকট তার দোওয়াত দিয়ে লেখার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন: হে অমুক তুমি লিখতে পার! আর এটাই হচ্ছে গভীর খোদাভীতি।
- খোদাভীতির ব্যাপারে একটি মূলনীতি: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন: ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বিষয়ের মধ্যে যুহদ (দুনিয়া বিমুখীতা) ও তাকওয়া হয় না। যুহদ ও তাকওয়া হয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে।

وكانوا لنا خاشعين

আর তারা আমার প্রতি বিনীত

ইমাম তবারী রহ: বলেন: অর্থাৎ তারা আমার প্রতি বিনয়ী ও অনুগত, আমার ইবাদত করতে ও আমাকে ডাকার ব্যাপারে অহংকার করে না।

আবুদ দারদা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: এই উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি উঠিয়ে নেওয়া হবে তা হচ্ছে 'খুশু' (বিনয়)। ফলে তাদের মাঝে আর বিনয়ী লোক দেখতে পাবে না। (ইমাম তবারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর ইমাম আলবানী তা সহীহ বলেছেন)

- আমরা কেন বিনয়ী হই না? প্রকাশ্যভাবে সবার মাঝে যে অন্তরের কাঠিন্যতা, চক্ষুর শুস্কতা ও চিন্তাহীনতা দেখা যাচ্ছে এটা আসলে দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে। দুনিয়া আমাদের অন্তরে প্রবল হয়ে গেছে। ফলে আমাদের ইবাদতেও এটা আমাদের সাথে থাকে। অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ তার সাথে যুক্ত সকল ময়লা থেকে পবিত্র হতে না পারবে।
- সকল আরিফ বিল্লাহ গণ (আল্লাহর পরিচয় লাভকারীগণ) এ ব্যাপারে একমত যে, বিনয়ের কেন্দ্রস্থল হল অন্তর। আর তার ফলাফল প্রকাশ পায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তাই বিনয়ীরা হয় আল্লাহর প্রতি অনুগত ও ভীত।
- 'নামাযের খুশু' র তাফসীর করা হয়েছে এভাবে: তা হচ্ছে পূর্ণ মনোযোগ শুধু নামাযের জন্য নিয়োগ করা আর অন্য সকল কিছু থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে রাখা।

- ‘খুশু’এর মূল কথা: খুশু হচ্ছে অন্তর নরম, কোমল, প্রশান্ত, অনুগত ও নত হওয়া। তাই যখন অন্তর ‘খুশুওয়ালা’ (বিনয়ী) হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিনয়ী হয়। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো অন্তরের অনুগামী।
- পূর্বসূরীদের ‘খুশু’র কয়েকটি নমুনা: ইবনুয যুবায়র রা: যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন বিনয়ের কারণে এমন হয়ে যেতেন, যেন একটি কাঠ। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, চড়ুই পাখি তাকে গাছের ডালা মনে করে তার পিঠে বসত।
- খুশু না থাকার কারণে দু’টি মন্দ ফলাফল দেখা যায়:
  - প্রথমত: অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত না থাকা। কারণ নামাযই অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন: (إِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) “নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে”।
  - দ্বিতীয়ত: কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন না হওয়া। কারণ আল্লাহ তা’আলা কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ সফলতাকে যুক্ত করেছেন ‘খুশু’র সাথে। আল্লাহ তা’আলা বলেন: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) “অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। যারা স্বীয় নামাযে বিনয়ী-নম্র”।
- নামাযের প্রাণ: খুশুই হল নামাযের প্রাণ এবং তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। তাই খুশুহীন নামায হল প্রাণহীন দেহের ন্যায়।

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ: দেখলেন জনৈক লোক নামাযে খেলা-ধুলা করছে, তখন তিনি তাকে বললেন: যদি এই লোকের অন্তর নম্র ও বিনয়ী হত তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও নম্র ও বিনয়ী হত।

- মুনাফেকী (কপটতাপূর্ণ) বিনয়: আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তার নিকট পৌঁছেছে, আবুদ দারদা ও আবু হুরায়রা রা: বলেন: তোমরা কপটতাপূর্ণ বিনয়

থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। বলা হল: এটা কি!? তিনি বললেন: দেহকে খুশুওয়ালা দেখানো, কিন্ত অন্তর খুশুওয়ালা তথা বিনয়ী নয়।

- কিভাবে আমরা খুশুওয়ালাদের অন্তর্ভূক্ত হবো?
- প্রথমত: তুমি নামাযে তোমার নড়া-চড়া, স্থিরতা, কিরাত পাঠ, দাঁড়ানো, বসা ইত্যাদি সব কিছুতে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন' একথা মনে করবে। তাই খুশু শুধু নামাযের সাথে খাস নয়। এটি একটি অন্তরের ইবাদত, বান্দার প্রতিটি অবস্থায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর ফলাফল প্রকাশ পায়।
- দ্বিতীয়ত: স্বীয় রবকে পরিপূর্ণভাবে চিনবে, ফলে তা অন্তরে রবের মহত্ব সৃষ্টি করবে।
- তৃতীয়ত: তুমি মনে করবে ও একথা ভাববে যে, তুমি জাহান্নামের উপর 'পুলসিরাত' এ আছো। যেন তুমি তোমার চোখের সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখছো এবং হিসাবের স্থানে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছো।
- ঈমানী খুশু ও কপটতাপূর্ণ খুশুর মাঝে পার্থক্য: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: ঈমানী খুশু হল আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব, গাম্ভীর্য, ভয় ও তার থেকে লজ্জায় অন্তর আল্লাহর প্রতি নম্র ও বিনয়ী হওয়া। তার অন্তর যখন ভয়, অনুতাপ, ভালবাসা, লজ্জা ও আল্লাহর নিয়ামতরাজীর স্মরণে এবং স্বীয় অপরাধসমূহের দর্শনে আল্লাহর জন্য ভেঙ্গে যাবে, তখন তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই নম্র ও বিনয়ী হবে। আর এর ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিনয়ী হবে। পক্ষান্তরে কপটতাপূর্ণ বিনয় কৃত্রিমভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাবে, কিন্তু অন্তর নম্র ও বিনয়ী হবে না।
- নামাযের খুশু দুই প্রকার:
    - বাহ্যিক খুশু: তা হচ্ছে নামাযী ব্যক্তি স্থির থাকবে। সিজদার দিকে তার দৃষ্টি রাখবে; ডানে বামে দৃষ্টি ফেরাবে না। নামাযে খেলা-ধূলা ও ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া থেকে দূরে থাকবে।
    - আভ্যন্তরীণ খুশু: তা হবে আল্লাহর বড়ত্ব মনে উপস্থিত করা, আয়াত ও আযকারসমূহের অর্থ চিন্তা করা এবং শয়তানের বিভিন্ন কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার মাধ্যমে।

(إن الله يحب المتقين)

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

ইমাম তবারী রহ: বলেন: যে আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং তার ফরজগুলো পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: واعلموا أن الله مع المتقين "জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"

ইবনে আব্বাস রা: বলেন: অর্থাৎ আল্লাহ তার ঐ সকল বন্ধুদের সাথে আছেন, যারা তাদের প্রতি অর্পিত আল্লাহর আদেশ-নিষেধের দয়িত্বের ব্যাপারে তাকে ভয় করে।

ইমাম তবারী বলেন: অর্থাৎ "এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধের সময় তোমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমরা যদি আল্লাহর ফরজসমূহ পালন ও গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাকে ভয় কর, তাহলে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: শোনো! শরীরের মাঝে একটি মাংসপি- আছে, যখন তা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়।

- তাকওয়ার স্থান: ইবনে রজব বলেন: তাকওয়া বা পাপাচারের মূল উৎস হল অন্তর। তাই যখন অন্তর নেক ও তাকওয়াবান হয়ে যায়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নেককার হয়ে যায়। আর যখন অন্তর পাপাচারী হয়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাপাচারী হয়ে যায়।

- আবু হুরায়রা রা: কে বলা হল: তাকওয়া কি? তিনি বললেন: তুমি কি কখনো কণ্টকময় ভূমি অতিক্রম করেছো? লোকটি বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তখন কী করতে? লোকটি বলল: আমি তার থেকে আত্মরক্ষা অবলম্বন করতাম। তখন তিনি বললেন: ঠিক এভাবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে তাকওয়া।
- বেশি আমল, আবার বেশি গুনাহ: জনৈক লোক ইবনে আব্বাস রা: কে বলল: কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়; যে কম আমল করে এবং কম গুনাহ করে, সে; না যে বেশি গুনাহ করে, বেশি আমল করে? তিনি বললেন: আমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সমতুল্য কোন কিছুকে মনে করি না।
- মুত্তাকীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য:
  - তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই হক স্বীকার করে নেয়, মেনে নেয় এবং তা আদায়ও করে। আর বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করে, তা থেকে বেঁচে থাকে এবং সেই আল্লাহকে ভয় করে, যার নিকট কোন গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না।
  - মুত্তাকীগণ আল্লাহর কিতাবের ইলম রাখেন, অত:পর তা যা হারাম করেছে, তাকে হারাম বলেন এবং তা যা হালাল করেছে, তাকে হালাল বলেন।
  - আমানতের খেয়ানত করে না, পিতামাতার অবাধ্যতা করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে না, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, স্বীয় মুসলিম ভাইদেরকে মারে না, যারা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করে।
  - যারা তাদেরকে বঞ্চিত করে, তারা তাদেকে দান করে, যারা তাদের প্রতি জুলুম করে, তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়।
  - তাদের থেকে কল্যাণের প্রত্যাশা করা হয়, তাদের তরফ থেকে কোন প্রকার অকল্যাণ আসা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
  - তারা গীবত করে না, মিথ্যা বলে না, মুনাফেকী (কপটতা) করে না, চোগলখোরী করে না, হিংসা করে না।

- লোক দেখানো কোন কিছু করে না, মানুষকে সন্দেহে ফেলে না, মানুষের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে না।
- অদৃশ্যের ব্যাপারে তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা কিয়মাত দিবসের ব্যাপারে থাকে ভীত।

- তাকওয়ার মূলকথা: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ সে সমস্যাজনক বিষয়ে পতিত হওয়ার আশংকায় সমস্যাহীন জিনিস থেকেও বিরত থাকবে না। (বর্ণনা করেছেন তিরমিযী রহ:)
- আল্লাহর নিকট মর্যাদার মানদন্ড হল তাকওয়া। আল্লাহ বলেন: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللـــه أَتْقَاكُمْ) "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে ই, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।" আল্লামা সা'দী রহ: বলেন: আল্লাহর নিকট মর্যাদা তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান সে ই, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান, তথা সর্বাধিক আনুগত্যকারী, গুনাহ থেকে দূরত্ব অবলম্বনকারী। সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজন, লোকবল বা বংশ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন এবং অধিক খবর রাখেন, কে গোপনে-প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে, আর কে শুধু প্রকাশ্যে ভয় করে, গোপনে ভয় করে না। অত:পর তিনি প্রত্যেককেই আপন আপন প্রাপ্য অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।

  এটা বোঝার পর এটাও জানতে হবে যে, তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং মুত্তাকী তারাই, যাদেকে আল্লাহ ঐ কাজে দেখতে পান, যে কাজের প্রতি তিনি তাদেরকে আদেশ করেছেন। আর যে কাজ থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন, তারা তার দিকে অগ্রসর হয় না।

- তাকওয়া এবং স্বপ্নে তার প্রতিক্রিয়া: হিশাম ইবনে হাস্সান বলেন: ইবনে সিরীন রহ: কে শত শত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হত, তিনি তার কোনটারই দিতেন

না; শুধু একথা বলতেন: আল্লাহকে ভয়, উত্তমভাবে রাত্রি জাগরণ কর। কারণ তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো, তা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

- আল্লাহকে ভয় কর:
  লোকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন: হে বৎস! আল্লাহকে ভয় কর, আর মানুষকে দেখাইওনা যে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। যাতে মানুষ তোমাকে সম্মান করে, অথচ তোমার অন্তর থাকে পাপিষ্ঠ।
- জা'ফর বলেন: আল্লাহকে ভয় কর; দ্বীনের ব্যাপারে তোমার নিজস্ব খেয়ালমত যুক্তি খাটিও না। কারণ সর্বপ্রথম যুক্তি খাটিয়েছে ইবলিস। আল্লাহ যখন তাকে আদমকে সিজদা করতে আদেশ করলেন, তখন সে বলেছিল: "আমি তো তার থেকে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে"।
- ইমাম সুদ্দি রহ: আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বলেন: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ("নিশ্চয়ই মুমিন হল তারাই, যাদের নিকট আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে।") তিনি বলেন: অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে জুলুম করতে ইচ্ছা করে অথবা (বলেছেন,) গুনাহ করতে ইচ্ছা করে, তখন তাকে বলা হয়: আল্লাহকে ভয় কর! তখন তার অন্তর কেঁপে উঠে।
- দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করছিল। তাদের একজন বেশি বেশি শপথ করছিল। ইত্যবসরে আরেক ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা শুনে তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অধিক শপথকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলল: হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর; বেশি বেশি শপথ করো না। কারণ তুমি শপথ না করার কারণে তোমার রিযিক বাড়বে না বা কমবে না।
- আবু হানিফা রহ: কে বলা হল: আল্লাহকে ভয় করুন! পরিবর্তন আনুন। মুক্তমনা হোন! নত হোন! তিনি বললেন: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

الصدق منجاة

সত্যই মুক্তি

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো আর সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"

- সততার নিদর্শন: কথা ও কাজে শুধু আল্লাহকেই উদ্দেশ্য করা, অড়ম্বরতা পরিহার করা, মাখলুকের প্রতিদান কামনা করা এবং সত্য কথা বলা।

  তোমার যবানকে সত্য ও কল্যাণকর কথা বলতে অভ্যস্ত কর: কারণ নবী সা: বলেন: মানুষের জিহ্বার ফসলই মানুষকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে ফেলে।

  তোমার যবানকে সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত কর, তাহলে তুমি সৌভাগ্যবান হতে পারবে। নিশ্চয়ই যবানকে তুমি যাতে অভ্যস্ত করবে, সে তাতেই অভ্যস্ত হবে।
- সত্য সর্বাবস্থায়ই কল্যাণকর: ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: বলেন: সত্য আমাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া (যা খুব কমই হয়), আমার নিকট মিথ্যা আমাকে উপরে উঠিয়ে দেওয়া থেকে উত্তম (যা খুব কমই হয়)।

  জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন: সত্য তোমাকে মুক্তি দিবে, যদিও তুমি তাকে ভয় কর। আর মিথ্যা তোমাকে ধ্বংস করবে, যদিও তুমি তাকে নিরাপদ মনে কর।

  শায়খুল ইসলাম বলেন: তাই সত্য হল সকল কল্যাণের চাবি, অনুরূপ মিথ্যা হল সকল অকল্যাণের চাবি।
- কখন তুমি সততা থেকে বঞ্চিত হবে? সাহল আত-তাসতারী বলেন: যে অনর্থক কথাবার্তা বলে, সে ই সততা থেকে বঞ্চিত হয়।
- সর্বনিম্ন সত্য: কুশায়রী বলেন: সর্বনিম্ন সত্য হল প্রকাশ্য ও গোপন একরকম হওয়া।

- সত্যই শ্রেষ্ঠ সহায়ক: শায়খুল ইসলাম বলেন: যার থেকে আল্লাহ সততা পেয়েছেন, তাকে তিনি সাহায্য করবেন।
- সততার কয়েকটি নিদর্শন: যেকোন মুসিবত বা ইবাদত গোপন রাখা এবং মানুষ তা জানুক, তা অপছন্দ করা।
- সর্বাধিক উপকারী সততা: আল্লাহর নিকট নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করা। আর সর্বাধিক উপকারী লজ্জা হল: তার নিকট এমন কিছু চাইতে লজ্জা করা, যা তুমি ভালবাস; কিন্তু তুমি তার অপছন্দনীয় কাজ কর।
- সূক্ষ হিসাব: আবেদা উম্মে রাবিয়া শামী বলেন: আমি আমার কথায় সততার কমতি থাকার কারণে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি, ক্ষমা প্রার্থনা করি।
- সততা এবং স্বপ্নে তার প্রতিক্রিয়া:
    - শায়খুল ইসলাম বলেন: নেককারদের স্বপ্ন বেশিরভাগ সত্য হয়। কখনো তাতে এমন কিছুও দেখা যায়, যা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না।
    - ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যে চায়, তার স্বপ্ন সত্য হোক, সে যেন সর্বদা সত্য বলে। এর সারকথা হল নবী সা: এর এই হাদিস- "তোমাদের মধ্যে যে কথায় সর্বাধিক সত্যবাদী, তার স্বপ্নও সর্বাধিক সত্য"। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)
    - সত্য কথা কখনো কখনো কবীরা গুনাহকেও মিটিয়ে দেয়: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন: কখনো একটি নেক কাজের সাথে সততা ও দৃঢ় বিশ্বাস যুক্ত থাকার কারণে তা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা অনেক কবীরা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।
    - কিভাবে তুমি তোমার নামাযে সত্যনিষ্ঠ হবে? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: সত্য নিষ্ঠতা ও কল্যাণকামীতার নিদর্শন হল, নামাযে অন্তর আল্লাহর জন্য মুক্ত হওয়া, আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ফিরানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা, স্বীয় অন্তরকে নামাযের মধ্যে জমানো এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে নামায আদায় করা। কারণ নামাযের একটি প্রকাশ্য ও একটি ভিতরগত দিক আছে।

- সততার বিভিন্ন প্রকার: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: তাই "যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন"- আয়াতের অর্থ হল: 'কথা, কাজ ও অবস্থায় সততাই যার বৈশিষ্ট্য'। সততা হয় এই তিনটি জিনিসের মধ্যে।
- কথায় সততা হল: শস্যের ছড়ার সাথে কান্ডের যেরূপ মিল থাকে, কথার সাথে যবানের সেরূপ মিল থাকা।
- কাজে সততা: দেহের সাথে মাথার যেরূপ মিল থাকে, কাজকর্ম ও বাস্তবতার সাথে অনুরূপ মিল থাকা।
- অবস্থায় সততা: অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী ইখলাসওয়ালা হওয়া এবং এর জন্য সর্বসাধ্য চেষ্টা করা।

এ সকল বিষয়গুলোর মাধ্যমে একজন বান্দা "সত্য নিয়ে আগমন করেছে" অভিধার উপযুক্ত হবে। আর এসকল জিনিসগুলোর পূর্ণাঙ্গতা ও যথাযথ বাস্তবায়নের দ্বারা 'সিদ্দিক' এর বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে।

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

আল্লাহর প্রতি সুধারণার তাৎপর্য কি: তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি এমন ধারণা পোষণ করা, যা তার জন্য উপযুক্ত এবং এমন বিশ্বাস রাখা, যা তার মহত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার উত্তম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীর দাবি অনুযায়ী হয়। যা মুমিনের জীবনে এমন প্রভাব সৃষ্টি করবে, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। আলী ইবনে আবি তালিব রা: বলেন: আল্লাহর প্রতি সুধারণা হল: তুমি কেবলমাত্র আল্লাহর থেকেই আশা করবে, আর শুধু মাত্র তোমার গুনাহের ভয় করবে।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না: তোমার এমন কোন গুনাহই হতে পারে না, যা তোমাকে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে বাঁধা দিতে পারে এবং তার রহমত থেকে নিরাশায় ফেলতে পারে। কারণ যে স্বীয় রবকে এবং তার দয়া ও উদারতাকে জেনেছে, সে তার দয়া ও ক্ষমার সামনে নিজের গুনাহকে ছোটই মনে করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)

"বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

- মৃত্যুর সময় সুধারণা রাখা: ইমাম ইশবালী বলেন: মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা তো ওয়াজিব। রাসূলুল্লা সা: বলেন: তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণার অবস্থা ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

  আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বলেন: যখন তোমরা দেখবে, কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তাকে সুসংবাদ দিবে, যাতে সে স্বীয় রবের প্রতি সুধারণা রাখা অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ করে। আর যখন সে জীবিত থাকে, তখন তাকে তার রবের ব্যাপারে ভয় দেখাবে এবং তার কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।
- আল্লাহর প্রতি সুধারণার একটি নিদর্শন: আল্লাহর ইবাদতে খুব বেশি পরিশ্রম করা।
- অন্তরের স্বস্তি: বলা হয়ে থাকে: নিরাশা নিরাশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আর সুধারণা পোষণ করার মাঝে অন্তরের আরাম ও স্বস্তি আছে।
- সুধারণার ফলাফলসমূহ:
  - আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন: সেই সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই! যে কেউ আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখবে, আল্লাহ তাকে উক্ত ধারণা অনুযায়ী দান করবেন। কারণ কল্যাণ তারই হাতে।
  - সুহাইল বলেন: আমি মালিক ইবনে দিনারকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম: হে আবু ইয়াহইয়া! আমি যদি জানতাম, তুমি আল্লাহর সামনে কি নিয়ে উপস্থিত হয়েছো! তিনি বললেন: আমি অনেকগুলো গুনাহ

নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহর প্রতি আমার সুধারণা যেগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছে।

- ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যখনই বান্দা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা, ভাল আশা ও যথাযথ তাওয়াক্কুল করে, তখন আল্লাহ তা'আলা কখনোই তার আশা ভঙ্গ করেন না। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কোন আশা পোষণকারীর আশা ব্যার্থ করেন না এবং কোন আমলকারীর আমলকে নষ্ট করেন না।
- আল্লাহর প্রতি সুধারণা অন্তরকে আমলের উপর শক্তিশালী করে। কারণ তখন তো আপনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আপনার দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করবেন, তিনি স্বীয় বান্দার সব খবর রাখেন এবং তিনি দৃঢ় ও প্রচন্ড শক্তির অধিকারী।
- আল্লাহর প্রতি সুধারণা উত্তম পরিসমাপ্তির একটি মাধ্যম। আর মন্দ ধারণা মন্দ পরিসমাপ্তির কারণ। তাই বান্দার উচিত, একথার প্রতি বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ অনুপরিমাণ জুলুম করেন না, তিনি মানুষের প্রতি সামান্যতম জুলুম করবেন না। তিনি তার প্রতি বান্দার ধারণা অনুপাতে বান্দাকে দান করেন। নবী কারীম সা: বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলছেন: আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুপাতে ব্যাবহার করি। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকিই। (বুখারী ও মুসলিম)
- জনৈক নেককার বলেছেন: তোমার যেকোন বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহর প্রতি সুধারণার আমলটি কর। কারণ এটাই সমাধাণের সহজ পথ।
- মুমিন যতক্ষণ স্বীয় রবের প্রতি সুধারণা রাখে, ততক্ষণ তার অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং তার মন স্বস্তিতে থাকে। আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি ও স্বীয় রবের প্রতি আনুগত্যের মহামূল্যবান চাদর তাকে ঢেকে নেয়।
- মুমিনের অন্তর তার রবের প্রতি সুধারণা রাখে, সর্বদা তার থেকে কল্যাণেরই আশা করে, সুখে-দু:খে সর্বদা তার থেকে কল্যাণের আশা করে এবং আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখে যে, তিনি সর্বাবস্থায়ই তার কল্যাণ চান। কারণ তার অন্তর তো আল্লাহর সাথে মিলিত। আর আল্লাহ হতেই অবিরত কল্যাণের

ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। তাই যখনই অন্তর তার সাথে মিলিত হবে, তখনই সে এই প্রকৃত বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারবে, তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

- একটি মন্দ ভুল ও অবমাননাকর অজ্ঞতা:

সাফারিনী বলেন: অনেক জাহেলরা ধারণা করে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো ছেড়ে দেওয়া সত্তেও শুধু আল্লাহর বিস্তৃত রহমত ও ক্ষমার উপর ভরস রাখা ও তার প্রতি সুধারণা পোষণ করাই সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। এটা একটি মন্দ ভুল, অবমাননাকর অজ্ঞতা। কারণ তুমি যার আনুগত্য করো না, এমন কারো দয়ার আশা করা বোকামী ও আত্মপ্রবঞ্চনা। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে-

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ)

"অত:পর তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত) এর উত্তরাধিকারী হল এমন সব উত্তরপুরুষ, যারা এই দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রী (ঘুষরূপে) গ্রহণ করত এবং বলত, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে'। কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে পুনরায় আসলে তারা (ঘুষরূপে) তাও নিয়ে নিত।"

- বান্দার অন্তরে কিভাবে জমা হয়? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: একজন বান্দার অন্তরে কিভাবে এ দু'টি জিনিস একত্রিত হতে পারে যে, সে একথারও বিশ্বাস করবে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তার কথাবার্তা শোনেন, তার অবস্থান দেখেন, তার গোপন-প্রকাশ্য সব কিছু জানেন, তার কোন গোপন বিষয়ই তার নিকট গোপন নয়, সে তার সামনে দ-ায়মান হবে এবং তাকে তার প্রত্যেক কাজের জবাবদিহিতা করতে হবে, অথচ সে তার অসন্তুষ্টির মাঝে অবস্থান করছে, আদেশগুলো লঙ্ঘন করছে, তার হকসমূহ নষ্ট করছে, আর এতদ্বসত্তেও আবার সে আল্লাহর প্রতি সুধারণা করছে। এটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা ও অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছু?

- তাওয়াক্কুলের নামই কি আল্লাহর প্রতি সুধারণা? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: কেউ কেউ তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন: 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা করা'। কিন্তু প্রকৃত কথা হল, আল্লাহর প্রতি সুধারণা তাওয়াক্কুলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী। কারণ যার প্রতি তোমার খারাপ ধারণা বা যার থেকে তুমি আশা কর না, তার উপর তোমার তাওয়াক্কুল করা সম্ভব নয়।
- কিভাবে আল্লাহর প্রতি সুধারণা আছে বলে বুঝতে পারবে?
    - তা এভাবে যে: তোমার মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমার সমস্যা সমাধানকারী, তিনিই তোমার পেরেশানী দূরকারী। কারণ বান্দা যখন তার রবের প্রতি সুধারণা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার বরকতের দরজাসমূহ এমনভাবে খুলে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। তাই হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করবে, তাহলে তুমি আল্লাহর থেকে এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমাকে আনন্দিত করবে। আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুসারে কাজ করি। সে যদি ভাল ধারণা করে, তাহলে তাকে তা ই দান করি, আর সে যদি খারাপ ধারণা করে, তাহলে তাকে খারাপই দেই। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ)
    - তাই আল্লাহর প্রতি তোমার ধারণা সুন্দর কর এবং তোমার আশা-ভরসা শুধু তার সাথে সম্পৃক্ত কর আর আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক, কারণ এটা মারাত্মক ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যারা আল্লাহর সম্পর্কে কু-ধারণা করে। মন্দ পালাবর্তন তাদেরই উপর। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে নিজ রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

- মুমিনের ধারণা ও মুনাফিকের ধারণার মাঝে পার্থক্য: হাসান বসরী রহ: বলেন: মুমিন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা করে ভাল আমল করে। আর মুনাফিক খারাপ ধারণা করে খারাপ আমল করে।
- কিসে তোমাকে ভাল আমলে উদ্বুদ্ধ করবে?
  - আবু হুরায়রা রা: বলেন: আল্লাহর প্রতি সুধারণা আল্লাহর জন্য উত্তম ইবাদত করার মত।
  - জেনে রেখ, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা করা মানেই হচ্ছে ভাল আমল করা। কারণ যে বিষয়টি বান্দাকে ভাল আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি তার এই ধারণা যে, আল্লাহ তাকে তার আমলের প্রতিদান বা বিনিময় দান করবেন এবং তার থেকে তা কবুল করবেন। তাহলে যে জিনিসটি তাকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করল, তা হচ্ছে সুধারণা। তাই যখনই তার রবের প্রতি তার ধারণা সুন্দর হবে, তখনই তার আমলও সুন্দর হবে। অন্যথায় প্রবৃত্তির অনুসরণের সাথে আল্লাহর প্রতি সুধারণা অনর্থক।
  - মোটকথা মুক্তির মাধ্যমগুলো অর্জন করার সাথেই সুধারণা হয়ে থাকে। ধ্বংসের কাজ করে সুধারণা করা যায় না ।
  - মন্দ আশা: ওয়াজিব বিষয়সমূহ ছেড়ে দিয়ে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখাই হচ্ছে মন্দ আশা। এর মানে হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি হতে ভাবনাহীন হয়ে যাওয়া।
  - আল্লাহর প্রতি ধারণার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: অধিকাংশ সৃষ্টিজীব, বরং আল্লাহ যাদেরকে চেয়েছেন, এমন কিছু লোক ব্যতীত সবাই আল্লাহর প্রতি নাহক মন্দ ধারণা করে। কারণ বেশিরভাগ মানুষ মনে করে, তাকে তার হক দেওয়া হয়নি। তার অংশ কম দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, সে তার থেকে অধিক হকদার ছিল।

তার অবস্থার ভাষা হল: আমার রব আমার প্রতি জুলুম করেছে এবং আমি যার হকদার ছিলাম আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এ ব্যাপারে তার মন তার বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু মুখে সে তা স্বীকার করে না বা স্পষ্টভাবে বলার মত দু:সাহসিকতা দেখায় না।

- আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা ভয়ংকর: কারণ আল্লাহর প্রতি সুধারণা তাওহীদের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয়। যা আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ, পরাক্রম, হিকমত ও তার সমস্ত নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান রাখার কারণেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার প্রতি মন্দ ধারণা তাওহীদের বিরোধী।
- আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার কয়েকটি নমুনা:
  - যে আল্লাহর প্রতি এই ধারণা করবে যে, আল্লাহ তার রাসূলকে সাহায্য করবেন না, তার বিষয়কে পূর্ণতা দান করবেন না, তাকে শক্তিশালী করবেন না, তার দলকে শক্তিশালী করবেন না, তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় ও পরাক্রম দান করবেন না, আল্লাহ তার দ্বীন ও কিতাবকে সাহায্য করবেন না, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।
  - যে আল্লাহর ব্যাপারে এমনটা সম্ভব মনে করল যে, তিনি তাঁর ওলীদেরকে তাদের নেক আমল ও ইখলাস সত্ত্বেও শাস্তি দেন বা তাদের সাথে ও তাদের শত্রুদের সাথে সমান আচরণ করেন, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।
  - যে আল্লাহর প্রতি ধারণা করল, আল্লাহ তার সৃষ্টিজীবকে আদেশ-নিষেধ ছাড়া এমনিতেই ছেড়ে দিবেন, তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হবে না, তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হবে না; বরং তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় অনর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল।
  - যে ধারণা করল, সে আল্লাহর আদেশ পালন করত: শুধু তারই সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ তার উক্ত নেক আমল নষ্ট করে দেন এবং বান্দার পক্ষ থেকে কোন কারণ ছাড়া সেগুলোকে নিস্ফল করে দেন অথবা তার দোষ ছাড়া তাকে শাস্তি দেন, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।
  - আল্লাহ আল্লাহর নিজের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করেছেন বা তার রাসূলগণ তার ব্যাপারে যা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে তার বিপরিত

ধারণা করল অথবা তার হাকিকতকে অকার্যকর করে দিল, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।

- যে ধারণা করল, সে আল্লাহর জন্য কোন কিছু বর্জন করলে, আল্লাহ তাকে এর থেকে উত্তম বিনিময় দান করবেন না, অথবা কেউ আল্লাহর জন্য কোন কিছু করলে তিনি তাকে তার থেকে উত্তম কিছু দান করবেন না, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।
- যে ধারণা করল, আল্লাহ কোন অপরাধ ছাড়া তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে শাস্তি দিবেন বা তাকে বঞ্চিত করবেন, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।
- যে ধারণা করল, সে যদি সত্যিকার অর্থেও আল্লাহকে ভালবাসে, ভয় করে, তার নিকট মিনতি করে, প্রার্থনা করে, সাহায্য চায় এবং ভরসা করে, তথাপি আল্লাহ তাকে ব্যার্থ করবেন, তার আবেদন পুরা করবেন না, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল এবং তার শানে যা উপযুক্ত নয়, তার প্রতি তা ধারণা করল।

• এক হৃদয়বান বন্ধুর উপদেশ: তাই নিজের হিতকামনাকারী জ্ঞানীদের জন্য এই স্থানটি লক্ষণীয়! স্বীয় রবের প্রতি মন্দ ধারণার জন্য প্রতিটি সময় তাওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত। বস্তুত নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা করা উচি, যেটা সকল মন্দের উৎস, সকল অনিষ্টের মূল এবং যা অজ্ঞতা ও জুলুমে আধার। তাই আহকামুল হাকিমীন, সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসাফগার ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার চেয়ে নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা করাই অধিক উপযুক্ত।

(استعينوا بالله واصبروا)

আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও ও ধৈর্য্য ধারণ কর

আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার সঙ্গা: তা হচ্ছে বান্দা কর্তৃক আস্থা ও ভরসা সহ পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে স্বীয় রবের নিকট সাহায্য চাওয়া। আর এটা শুধু আল্লাহর জন্যই হতে পারে। আর এর মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত:

১. আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হওয়া।
২. মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা।
৩. আল্লাহর উপর ভরসা করা। এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে পারে।

সুতরাং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে এই তিনটি বিষয়ের ধারণা করে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল, সে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করল।

- বহু ফিৎনা ও প্রবৃত্তি পূজার যামানায় আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার গুরুত্ব:
  - সর্বোচ্চ সাহায্য কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটই চাওয়া হবে: কারণ এটা ফেৎনার যামানা। প্রবৃত্তি পূজার যামানা। এমন যামানা, যখন মানুষ শয়তানরা যিন শয়তানদের থেকে বড় চক্রান্তকারী হয়ে গেছে এবং ইবলিশরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, মানুষকে তাদের দ্বীনদারী, পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র থেকে ফিরিয়ে রাখতে। তারা এমন এমন অশ্লীলতা ও হীনকাজ আবিস্কার করছে, যা আকলও কল্পনা করতে পারে না।
  - সুতরাং মানুষের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, বেশি বেশি দু'আ করা এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক। যাতে নিজেকে আল্লাহর হারামসমূহ থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়, এসকল ফেৎনার মুকাবেলায় দৃঢ় সংকল্প করা যায় এবং স্বীয় আত্মরক্ষার বিষয়সমূহ অর্জন করা সহজ হয়। হাদীসের

মধ্যে এসেছে: “তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন ফেৎনা থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর”। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও মুসলিম রহ:)

- আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার ফলাফলসমূহ:
  - শায়খুল ইসলাম রহ: বলেন: যখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তার থেকে পথনির্দেশ কামনা করা হয়, তার নিকট দু'আ করা হয়, তার নিকট মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা হয় এবং তিনি যে পথে চলার আদেশ করেছেন সে পথে চলা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে স্বীয় হুকুমে সেই হকের ব্যাপারে পথনির্দেশ করেন, যাতে তারা মতবিরোধে লিপ্ত ছিল। আর আল্লাহ যাকে চান, সরল পথের দিশা দেন।
  - যখন একজন মুসিলম জানবে যে, যে অমুখাপেক্ষী ক্ষমতাবানের হাতে সকল কল্যাণ রয়েছে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা, তখন সে সৃষ্টিজীব থেকে ভ্রুক্ষেপহীনতা ও অমুখাপেক্ষীতার শিক্ষা লাভ করবে। সে জানতে পারবে যে, তা পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে তার সাথে সম্পর্ক গড়া, তার উপর ভরসা করা, তার ইবাদত করা এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করা। সাথে সাথে চেষ্টা ও আমলের উপাদানগুলোও গ্রহণ করবে। এভাবে একজন মুসলিম তার চেহারাকে লাঞ্ছনা ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে এবং যেকোন মানুষের নিকট হাত পাতা ও নত হওয়া থেকে হেফাজত করতে পারবে। ফলে তার সম্মান রক্ষা পাবে এবং তার মর্যাদা ও অবস্থান সুসংরক্ষিত থাকবে।
  - ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: সর্বদা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার সন্তুষ্টির কার্যাবলী সম্পাদন করা ব্যতীত শয়তানের ফাঁদ ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই।
  - কোন ইবাদত পালনের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা: যেমন আযানে حيَّ على الصلاة ও حيَّ على الفلاح (তথা ‘নামাযের দিকে আসো, সফলতার দিকে আসো’) বলার সময় لا حول ولا قوة إلا بالله (তথা ‘আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি ও সাহায্য নেই’) বলা। কারণ এটা নামায আদায়ের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা পরকালে মুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য বড় মাধ্যম হবে। কারণ দয়মায় আল্লাহর দানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যেমন কবি বলেন:

যখন কোন যুবকের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য থাকবে না,
তখন তার প্রচেষ্টাই সর্বপ্রথম তার সাথে শত্রুতা করবে।

- জনৈক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন: যখন শয়তান তোমার নিকট গুনাহকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেখাবে, তখন তুমি কি করবে? সে বলল: আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। তিনি বললেন: এটা তো অনেক দীর্ঘ। আচ্ছা বল তো, তুমি যদি একটি বকরির পালের নিকট দিয়ে গমন কর আর তখন তার কুকুরটি তোমাকে ঘেউ ঘেউ করে, পথ অতিক্রম করতে বাঁধা দেয়, তখন তুমি কি করবে? সে বলল: আমি তার সাথে লড়াই করবো এবং সর্বসাধ্য দিয়ে তাকে ফিরাবো। তিনি বললেন: এটা দীর্ঘ হবে। কিন্তু তুমি যদি বকরীর রাখালের সাহায্য প্রার্থনা কর, তাহলে সে ই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এমনিভাবে যখন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাইতে চাইবে, তখন তার সৃষ্টিকর্তার নিকট সাহায্য চাইবে। তাহলে তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তোমাকে সাহয্য করবেন।
- যে সকল বিষয় কষ্ট দূর করে: আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা, তার উপর ভরসা করা, তার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং তার তাকদীরের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।
- প্রতিটি সময় আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা: শায়খুল ইসলাম বলেন: বান্দা আল্লাহর ইবাদতের জন্য ও অন্তর স্থির রাখার জন্য সর্বদাই আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মুখাপেক্ষী। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।
- বান্দার আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা, তাওয়াক্কুল করা ও আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হল, যেহেতু আল্লাহই তাকে তার ইবাদতে নিয়োজিত করেন এবং তার অবাধ্যতার বিষয়াবলী থেকে দূরে রাখেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য ব্যতিত নিজ শক্তিতে সে তা করতে পারত না। কারণ যে বিপদাপদের

তিক্ততা আস্বাদন করেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ব্যতীত তা প্রতিহত করতে নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরেছে, তার অন্তরই অন্যদের তুলনায় একথার অধিক সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

- তিনটি বিষয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক:

    ১. ইবাদতসমূহ সম্পদানের ব্যাপারে
    ২. নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনের ব্যাপারে
    ৩. তাকদীরী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সবর করার ব্যাপারে।

- বান্দা অক্ষম: বান্দা নিজে নিজে এ বিষয়গুলো অর্জন করতে অক্ষম। নিজ প্রতপালকের নিকট সাহায্য চাওয়ার কোন বিকল্প নেই। আর বান্দাকে তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল কল্যণে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ।
- গভীর প্রজ্ঞাবানী: যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন, সে ই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহর হকের ব্যাপারে অবহেলা করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন না। সে হয় বঞ্চিত।
- একাটি মারাত্মক ভুল: অনেক মানুষ নেক আমল ও নেক নিয়্যতের ভরসায় আল্লাহ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ও তার নিকট মুখাপেক্ষীতা ও দীনতা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। এটা একটি মারাত্মক ভুল। সকল আল্লাহওয়ালা বান্দাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বান্দার যত কল্যাণ সাধিত হয়, তা মূলত আল্লাহ তা'আলার তাওফীকেই হয়। আর বেশি বেশি দু'আ, প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া এবং বেশি বেশি মুখাপেক্ষীতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করার দ্বারাই আল্লাহর তাওফীক লাভ হয়। আর এগুলোর ব্যাপারে অবহেলা করলে তাওফীক থেকে বঞ্চিত হতে হয়।
- কখন তোমার প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসবে? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যখনই বান্দা পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব করবে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর সর্বোচ্চ সাহায্য আসবে।
- আউযু বিল্লাহ পড়ার মধ্যেও আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রার্থনা রয়েছে: কুরআন পাঠে চিন্তা অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার একটি নমুনা হল: কুরআন

পাঠকারীর জন্য আউযু বিল্লাহ বলা এবং সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার বিধান দেওয়া হয়েছে। এতে কুরআন পাঠে- বিশেষত: যে সূরাটি এখন পড়ার ইচ্ছা করছে, তার মধ্যে- চিন্তা অর্জনের জন্য আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রার্থনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

- দুআর মধ্যেও আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রার্থনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে: দু'আর মধ্যে আল্লাহ থেকে সাহায্য প্রার্থনাও অন্তর্ভূক্ত। এটা সর্ব বিষয়ে ও সব সময় কাম্য। এটার অধিক গুরুত্বের কারণেই আমরা নামাযের প্রতি রাকাতে তার পুনরাবৃত্তি করি- (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). আর বান্দার জন্য কোন কিছুই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া করা সম্ভব নয়। যে এর থেকে বঞ্চিত হয়, সে ব্যার্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুন্নাহর উপর আমল করার আগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আশা রাখে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।"

ইমাম সা'দী রহ: বলেন: আদর্শ দুই প্রকার: উত্তম আদর্শ, মন্দ আদর্শ।

উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সা: এর মাঝে। যে তার আদর্শ গ্রহণ করল, সে এমন পথে চলল, যা তাকে আল্লাহর নিকট সম্মান লাভের পথে নিয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীম।

আর এই উত্তম আদর্শের পথে চলতে পারে এবং চলার তাওফীক দেওয়া হয় একমাত্র সেই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ ও পরকাল কামান করে। কারণ তার ঈমান, তার খোদাভীতি, তার প্রতিদান লাভের আশা ও তার শাস্তির ভয়ই তাকে রাসূলুল্লা সা: এর আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

রাসূলূল্লাহ সা: ব্যতীত অন্য কারো আদর্শ, যা রাসূলুল্লাহ সা: এর আদর্শের বিরোধী, তা মন্দ আদর্শ। যেমন রাসূলগণ যখন কাফেরদেরকে তাদের আদর্শ গ্রহণ করতে আহ্বান করতেন, তখন তারা বলত:

(إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ)

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি মতাদর্শের উপর পেয়েছি, আমরা তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করবো।"

- সুন্নাহকে আকড়ে ধরা কিসের প্রমাণ? সুন্নাহর প্রতিপক্ষ অনেক হওয়া সত্তেও সুন্নাহ আকড়ে ধরা মানেই ঈমানের সত্যতা, দৃঢ়তা এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা। যার নিকট আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর পথ স্পষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য মানুষের কারণে তা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়।
- নিশ্চয়ই সুন্নাহ আকড়ে ধরা মুক্তি ও সফলতার প্রমাণ, সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতার নিদর্শন, আল্লাহ পাকের তাওফীক ও দিকনির্দেশনা লাভের ইঙ্গিত এবং বিজয় ও কল্যাণের আলামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (وَمَنْ يُطِعِ اللــه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)। "আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, সে নিশ্চয়ই মহা সফলতা লাভ করবে।"
- সুন্নাহর উপর আমলই মুক্তি:

  ইমাম যুহরী রহ: বলেন: পূর্ববর্তী আলেমগণ বলতেন: সুন্নাহ আকড়ে ধরাই মুক্তি।

  ইমাম মালেক রহ: বলেন: সুন্নাহ হল নূহের তরী, যে তাতে আরোহন করবে, সে মুক্তি পাবে আর যে পিছনে থেকে যাবে সে ডুববে।

- যে সুন্নাহর উপর আমল করে, তার পুরস্কার:

  ১- মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর ভালবাসা: যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে, বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:। "... বান্দা নাওয়াফেলের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, একপর্যায়ে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে...।
  ২- সর্বদা নাওয়াফেলের ব্যাপারে যত্নবান হলে তা ফরজের ঘাটতিসমূহের ক্ষতিপূরণ করে।
  ৩- সুন্নাহর প্রতি আমলকারী তার অনুকরণকারীর সওয়াবও লাভ করে, যা উক্ত ব্যক্তির সওয়াবেও কোনরূপ ঘাটতি করে না। এটা বর্ণিত হয়েছে ইমাম মুসলিম রহ: এর একটি হাদিসে। তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: যে ইসলামের মধ্যে একটি উত্তম সুন্নাহর প্রচলন ঘটায়, সে তার নিজের প্রতিদানও লাভ করে এবং যে তার উপর আমল করে, তার প্রতিদানও লাভ করে। আর এটা তাদের প্রতিদানেও কোনরূপ ঘাটতি করে না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও মুসলিম রহ:)
- সুন্নাহ বাস্তবায়নে উচু হিম্মত: ইমাম আহমাদ রহ: বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ থেকে যে হাদিসটিই বর্ণনা করতাম, তার উপর নিজে আমল করতাম।
- ইমাম আহমাদ রহ: ফেৎনার সময় তিন দিন ইবরাহীম ইবনে হানীর ঘরে আত্মগোপন করে ছিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আরেক স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সা: হেরা গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করেন, তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাই আমার জন্য শোভনীয় নয় যে, আমি সাচ্ছন্দের সময় রাসূলুল্লাহ সা: এর অনুসরণ করবো আর সংকটের সময় তার অনুসরণ ছেড়ে দিবো।
- সুন্নাহর প্রতি যত্নশীলতার একটি উদাহরণ: আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা আলী ইবনে আবি তালিব রা: থেকে বর্ণনা করেন, আলী রা: বলেন: ফাতেমা রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট এসে একটি খাদেমের আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: আমি কি তোমাকে এর থেকে উত্তম বিষয় বলে দিব? তুমি ঘুমের সময় তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশ বার আল্লাহু

আকবার পাঠ করবে। (অত:পর বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন: একটি হল চৌত্রিশ বার) (আলী রা: বলেন) এরপর কখনো আমি তা ছাড়িনি। বলা হল: সিফফীনের যুদ্ধের রাতও না? তিনি বললেন: সিফফীনের যুদ্ধের রাতও না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

- সুন্নাহ অনুসরণের ফলসমূহ:

১- সুন্নাহর অনুসরণ ইবাদত কবুলের শর্ত।

সুফিয়ান রহ: বলেন: আমল ব্যতিত কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আর নিয়্যত ব্যতীত কথা, আমল কোনটাই সঠিক নয়। আর কথা, আমল ও নিয়্যত রাসূলুল্লাহ সা:এর সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত সঠিক নয়।

২- সুন্নাহর অনুসরণ ইসলামের প্রধান দু'টি মূলনীতির একটি। মূলনীতি দু'টি হচ্ছে:

ইখলাস - ইবাদত শুধুই আল্লাহর জন্য করাই হচ্ছে বান্দার ঈমান ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষের মূলকথা।

সুন্নাহর অনুসরণ - রাসূলুল্লাহ সা: এর আদর্শের অনুসরণ করা হচ্ছে বান্দার ঈমান ও মুহাম্মাদ সা: কে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়ার মূলকথা।

৩- সুন্নাহর অনুসরণ জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম: এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সা:এর এই হাদীস- আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যারা অস্বীকার করে, তারা কারা? রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: যারা আমার অনুসরণ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই অস্বীকার করল। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

৪- সুন্নাহর অনুসরণ আল্লাহর ভালবাসার দলিল: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী-

(قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللــه فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللــه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللــه غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

“বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।”

৫- সুন্নাহর অনুসরণ তাকওয়ার নিদর্শন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللـــه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ). “এটাই নির্দেশ। আর যে আল্লাহর প্রতীকসমূহকে সম্মান করে, এটা (তার) অন্তরের তাকওয়ারই বহি:প্রকাশ।”

‘শাআইরুল্লাহ’ বা আল্লাহর প্রতীকসমূহ হল: আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তার দ্বীনের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ। আর এর সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান হল রাসূলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ ও তার আনিত শরীয়তের অনুসরণ করা।

(فاذكروني أذكركم)

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।"

ইমাম তবারী রহ: বলেন: অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধমে আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও আমার রহমত ও ক্ষমার মাধ্যমে তোমাদেরকে স্মরণ করবো।

আল্লামা সা'দী রহ: বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার যিকিরের আদেশ করেছেন আর এর জন্য সর্বোত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। তা হলো যে তাকে স্মরণ করবে, তিনিও তাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের ভাষায় বলেন:

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

"যে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি আর যে কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের থেকে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।"

- আল্লাহর সর্বোত্তম যিকর হল, যাতে অন্তর ও যবান এক হয়: এমন যিকরের দ্বারাই আল্লাহর পরিচয়, ভালবাসা ও অধিক সওয়াব লাভ হয়। যিকরই শুকরের মূল। একারণেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এটার প্রতি আদেশ করেছেন আর তারপর সাধারণভাবে শুকরের আদেশ করেছেন: وَاشْكُرُوا لِي "এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

- আল্লাহ তা'আলা বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللـــه ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধা তার তাসবীহ পাঠ কর।"
- নবী সা: প্রতিটি সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।
- ঈসা আ: থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: তোমরা আল্লাহর যিকর ছাড়া বেশি কথা বলো না। কারণ তাতে অন্তর শক্ত হয়ে যায়।
- তোমার ঘরকে আল্লাহর যিকরের স্থান বানাও। রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: যে ঘরে আল্লাহর যিকর করা হয়, আর যে ঘরে তার যিকর করা হয় না, উভয় ঘরের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

  সুতরাং ঘরকে অবশ্যই সর্বপ্রকার যিকরের স্থান বানানো উচিত। চাই অন্তরের যিকর হোক বা যবানের হোক, অথবা নামায, কুরআন তিলাওয়াত, ইলমে শরয়ীর আলোচনা, ধর্মীয় কিতাব পাঠ বা উপকারী ক্যাসেট শ্রবণ হোক।

  আজ কত মুসলিমের ঘর আল্লাহর যিকর না থাকার কারণে মৃত। বরং সেগুলোর অবস্থা হল, সর্বদা শয়তানের বাশি, গান, বাজনা, গীবত, চোগলখোরী, অপবাদ ইত্যাদিই চলতে থাকে। আল্লাহই আশ্রয়! তিনিই ভরসা!

  আর সর্বপ্রকার গুনাহ ও অন্যায়ের কেন্দস্থলে পরিণত হওয়ার কথা আর কি বলবো! যেমন অবৈধ মেলামেশা, গাইরে মাহরাম নিকটত্মীয় বা প্রতিবেশদের মধ্যে যারা ঘরে ঢুকে যায় তাদের সামনে প্রকাশ হওয়া ইত্যাদি।

  যে ঘরের এ অবস্থা, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করবে কিভাবে!? তাই আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন! আপনারা নিজেরদের ঘরগুলোকে সর্বপ্রকার আল্লাহর যিকর দ্বারা আবাদ করুন।
- সালামের মধ্যে আল্লাহর যিকর রয়েছে। মুজাহিদ রহ: বলেন: ইবনে ওমর রা: আমার হাত ধরে আমাকেসহ বাজারে যেতেন। তিনি বলতেন, আমি বাজারে যাই, কিন্তু আমার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এ জন্য যাই, যাতে আমি অনেক লোককে সালাম দিতে পারি এবং আমাকেও অনেকে সালাম দেয়। এতে আমি একটি দিয়ে

১০ টি লাভ করি। হে মুজাহিদ! সালাম একটি আল্লাহর নাম। তাই যে বেশি বেশি সালাম দিল, সে বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করল।

তুমি কি অনুভব করেছো, যখন তুমি তোমার মুসলমান ভাইদেরকে সালাম দাও, তখন তুমি আল্লাহর যিকর করছো?

- মহা উপকারী একটি জ্ঞাতব্য: জনৈক আলেম বলেন: কথা ও কাজের শুরুতে আল্লাহর যিকর করা হচ্ছে ঘৃণা থেকে ভালবাসা ও পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াত লাভের ন্যায়।
- আল্লাহর যিকরের মধ্যে রয়েছে ১০০ উপকারীতা: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: আল্লাহর যিকরের মধ্যে একশ'রও অধিক উপকারীতা রয়েছে। যিকর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, শয়তানকে বিতাড়িত করে, পেরেশানী দূর করে, রিযিক বৃদ্ধি করে, আল্লাহর ভয় ও স্বাদ সৃষ্টি করে, আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি করে, যা ইসলামের প্রাণ...।
- জান্নাতের প্রাসাদসমূহ কিভাবে নির্মাণ করা হয়? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: জান্নাতের প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করা হয় যিকরের দ্বারা। যিকরকারী যখন যিকর থামিয়ে দেয়, তখন ফেরেশতাগণ নির্মাণকাজও থামিয়ে দেন।
- নিফাক থেকে নিরাপত্তা: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: বেশি বেশি আল্লাহর যিকর নিফাক থেকে নিরাপত্তা দেয়। কারণ মুনাফিকরা আল্লাহর যিকর কম করে।

হৃদয়ের সচ্ছতা বা উদারতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“এবং যারা তাদের পরে এসেছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইদেরকেও, যারা আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।”

- হৃদয়ের সচ্ছতার অর্থ: হৃদয়ের সচ্ছতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা না থাকা।
- স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী কারা? রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল, প্রত্যেক স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ও সত্যভাষী লোক। সাহাবীগণ বললেন: সত্যভাষী তো আমরা বুঝি, কিন্তু স্বচ্ছ হৃদয় দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তিনি বললেন: আল্লাহভীরু ও পূত-পবিত্র মন, যাদের মাঝে অবাধ্যতা, জুলুম, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নেই। (বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ)
- জান্নাতের সর্বোত্তম রাস্তা: কাসিম আলজুয়ী বলেন: জান্নাতের সর্বোত্তম পথ হল হৃদয়ের স্বচ্ছতা।
- হৃদয়ের সচ্ছতার জন্য আল্লাহর নিকট দু’আ করা: রাসূলুল্লাহ সা: এর একটি দু’আ ছিল: হে আল্লাহ! আমার অন্তরের আক্রোশ দূর কওে দাও। আর তিরমিযী রহ: এর বর্ণনায় এসেছে এভাবে: “হে আল্লাহ আমার বুকের আক্রোশ দূর করে দাও। এটি একটি অতি উন্নত বৈশিষ্ট্য, খুব কম লোকই এতে গুণান্বিত হতে পারে। কারণ মনের জন্য এটা বড় কঠিন যে, সে তার স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তার অধিকার ছেড়ে দিবে। অপর দিকে বেশিরভাগ মানুষের মাঝেই জুলুম ও সীমালঙ্ঘন দেখা যাচ্ছে। তাই যে মানুষের জুলুম, অজ্ঞতা ও সীমালঙ্ঘনকে উদারতার দ্বারা মুকাবেলা করে, তার মন্দের মোকাবেলায় মন্দ প্রকাশ করে না, তার উপর হিংসা করে না, সে উন্নত ও মহান চরিত্রের উচ্চস্তর লাভ করে। এটা মানুষের মাঝে দুর্ল্লভ ও দুস্প্রাপ্য। কিন্তু যাদের জন্য আল্লাহ সহজ করেছেন তাদের জন্য সহজ। ইহা একমাত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যশীল। ইহা একমাত্র তারাই লাভ করে, যারা মহা সৌভাগ্যবান।

- জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য: সুতরাং একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিজেকে উদারতা ও ভিতরের সচ্ছতার শিক্ষা দিতে হবে। এটা হচ্ছে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ)

"তাদের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে, তা দূর করে দিব। তারা ভাই-ভাই রূপে মুখোমুখী হয়ে উচু আসনে আসীন হবে।"

- যেসকল বিষয় হৃদয়ের সচ্ছতা আনয়নে সাহায্য করে:

১- ইখলাস - ইখলাস হচ্ছে আল্লাহর নিকট যা আছে তার জন্য লালায়িত হওয়া আর দুনিয়া ও তার চাকচিক্য থেকে নিরাসক্ত হওয়া।
২- আল্লাহ যে বন্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। ইবনুল কায়্যিম রহ:বলেন: আল্লাহর বন্টনে সন্তুষ্টি হৃদয়ে সচ্ছতার দ্বার খুলে দেয়। তা অন্তরকে ধোঁকা, প্রতারণা ও হিংসা থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করে। আর কেউ আল্লাহর নিকট মুক্ত অন্তর নিয়ে আসা ব্যতীত আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে না। আর আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সাথে হৃদয়ের সচ্ছতা অসম্ভব। যখনই বান্দা আল্লাহর বন্টনে সর্বাধিক সন্তুষ্ট থাকবে, তখন তার হৃদয়ও তত বেশি মুক্ত পরিশুদ্ধ হবে। তাই কেউ আল্লাহর কিতাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবে, আল্লাহ তা'আলা পূত-পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী লোকদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা যথাযথভাবে অনুসরণকারীদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের একটি দু'আ থাকবে, যেন আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে বিদ্বেষ না রাখেন।
৩- কুরআন পাঠ ও তাতে চিন্তা করা: এটাই সকল রোগের চিকিৎসা। আর বঞ্চিত সেই, যে আল্লাহর কিতাবের চিকিৎসা গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ) "বল, ইহা ঈমানদারদের জন্য পথপ্রদর্শক ও চিকিৎসা।"
৪- হিসাব ও শাস্তিকে স্মরণ করা: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে সদা প্রস্তুত।"

সে যে কথাই বলে, প্রতিটি কথার সুতরাং যে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাকে প্রত্যেকটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে এবং হিসাব নেওয়া হবে, তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে, দুনিয়ার সব বিষয় থেকে সে নিরাসক্ত হয়ে যাবে এবং ঐ সকল কাজ করতে থাকবে, যা তাকে আল্লাহর নিকট উপকৃত করবে।

৫- দুআ: মুসলিমের জন্য আবশ্যক, নিজের জন্যও এই দু'আ করা এবং তার মুসলিম ভাইদের জন্যও এই দু'আ করা-

وَالذِّينَ جَآءُو مِن بَعدِهِم يَقُولُونَ رَبَنَا اغفِر لَنَا وَلإِخوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَان وَلاَ تَجعَل فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبَنَا إِنّكَ رَءُوفٌ رّحِيم

"এবং যারা তাদের পরে এসেছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইদেরকেও, যারা আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।"

৬- সুধারণা করা এবং মানুষের কথা ও অবস্থাকে উত্তম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান গুনাহ।"

ওমর রা: বলেন: যখন তুমি অসংখ্য ভাল প্রয়োগক্ষেত্র পাও, তখন তোমার মুসলিম ভাইয়ের কোন কথাকে মন্দ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে না।

৭- সালামের প্রসার করা: আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনয়ন করবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরে পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দিব না, যা তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করবে? তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম) আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: বলেন: তিনটি জিনিস তোমার প্রতি তোমার ভাইয়ের ভালবাসা সৃষ্টি করবে।

সাক্ষাতে প্রথমে তাকে সালাম দিবে, মজলিসে তার জন্য জায়গা করে দিবে এবং তাকে তার সবচেয়ে পছন্দনীয় নামে ডাকবে।

৮- মুসলমানদের জন্য কল্যাণকে ভালবাসা: আনাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা: থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রতিবেশীর জন্য অথবা (বলেছেন) তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিসই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

- মুসলমানদের জন্য কল্যাণকে ভালবাসার অন্যতম একটি কাজ হল তাদের জন্য দু'আ করা: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যেমনিভাবে সে পছন্দ করে, তার মুসলিম ভাই তার জন্য দু'আ করুক, তেমনিভাবে তারও উচিত তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করা। তাই সর্বদাই এই দু'আ করতে থাকবে- হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুসলিম, মুসলিমা ও মুমিন-মুমিনাকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের জনৈক সালাফ প্রত্যেকের জন্য এই দু'আ সর্বদা করা পছন্দ করতেন।

আমি আমাদের শায়খ ইবনে তাইমিয়াকে এই দু'আটি আলোচনা করতে শুনেছি এবং তিনি এর অনেক ফযীলত ও উপকারীতা বর্ণনা করেছেন, যা এখন আমার মনে নেই। তিনি প্রায়ই এটা বলতেন। আমি তাকে একথাও বলতে শুনেছি যে, দুই সিজদার মাঝখানেও এটা বলা জায়েয আছে।

- নির্মল অন্তর: ইবনুল আরাবী বলেন: অন্তর বিদ্বেষী, হিংসুক, আত্মগর্বী বা অহংকারী হয়েও নির্মল বা নির্ভেজাল হতে পারে না। রাসূল সা: ঈমানের জন্য শর্ত করেছেন, তার ভাইয়ের জন্যও তাই ভালবাসতে হবে, যা নিজের জন্য ভালবাসে।

ইবনে সিরীন রহ: কে জিজ্ঞেস করা হল: নির্মল অন্তর কি? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য তার সৃষ্টির ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করা।

শায়খুল ইসলাম বলেন: স্বচ্ছ ও প্রশংসিত হৃদয়হল, যা শুধু ভাল চায়, মন্দ চায় না। আর তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা হল ভাল মন্দ বোঝা। যে মন্দটা বোঝে না, তার মাঝে ত্রুটি আছে। সে প্রশংসিত নয়।

- গীবত-অপবাদ না শোনা এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতিবাদ করা। যাতে করে সকল মানুষ খাটি মনের হয়ে যায়।
- হৃদয়ের সচ্ছতার কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নমুনা: ফযল ইবনে আয়্যাশ বলেন: আমি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহের নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসের তার নিকট এক ব্যক্ত আসলো। সে বলল: আমি অমুকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম সে আপনাকে গালি দিচ্ছে। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন: শয়তান কি তোমাকে ছাড়া কোন খবরদাতা পেল না? তারপর আমি সেখান থেকে না উঠতেই উক্ত গালিদানকারী লোকটি সেখানে আসল। সে ওহাবকে সালাম দিল। তিনি উত্তর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করলেন এবং তাকে তার পাশে বসালেন।
- সুফিয়ান ইবনে দিনার বলেন: আমি আলী রা: এর একজন শীষ্য আবু বশিরকে বললাম: আমাকে আমাদের পূর্ববর্তীদের আমল সম্পর্কে কিছু বল তো। তিনি বললেন: তারা কম আমল করতেন, কিন্তু অধিক বিনিময় লাভ করতেন। আমি বললাম এটা কেন? তিনি বললেন: কারণ তাদের হৃদয় স্বচ্ছ ছিল।
- যায়দ ইবনে আসলাম বলেন: আবু দুজানা রা: এর মুমূর্ষ অবস্থায় তার নিকট যাওয়া হল। তখন তার চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছিল। তাকে বলা হল, ব্যাপার কি, আপনার চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করছে কেন? তিনি বললেন: আমি যত আমল করেছি, তার মধ্যে আমার দু'টি আমল অপেক্ষা ভারী আর কিছু পাইনি:
  - তার একটি হল, আমি অনর্থক কথাবার্তা বলতাম না।
  - আরেকটি হল, আমার অন্তর মুসলমানদের জন্য নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ ছিল।

حـــي عـــلـــى الجـــهاد

জিহাদের দিকে আস

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ باللـــه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللـــه بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশী ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য।"

জিহাদ হল জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ। হাসান বসরী রহ: বলেন: প্রত্যেকটি পথেরই একটি সংক্ষিপ্ত পথ আছে। আর জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ হল জিহাদ।

- অত্যাবশ্যকীয় ভালবাসার আলামত: শায়খুল ইসলাম বলেন: যার মধ্য জিহাদের প্রেরণা নেই, নির্ঘাত সে আবশ্যকীয় ভালবাসার দাবি আদায় করল না। তার মধ্যে নিফাক রয়েছে। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إنما المؤمنون الذين آمنوا باللــــه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللــــه أولئك هم الصادقون

"মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী।"

- জিহাদের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ: শায়খুল ইসলাম বলেন: জেনে রাখ, জিহাদের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ। আর তা বর্জনের মধ্যে রয়েছে ধ্বংস। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) "বল, তোমরা তো আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যেকোন একটির অপেক্ষায়ই আছো, বৈ কি?"

  অর্থাৎ হয়ত বিজয় ও সফলতা নতুবা শাহাদাত ও জান্নাত। সুতরাং মুজাহিদদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকেন, তারা সম্মানিত হয়ে বেঁচে থাকেন। তাদের জন্য আছে দুনিয়াবী প্রতিদান এবং পরকালীন মহা কল্যাণ। আর যারা মারা যান বা নিহত হন তাদের গন্তব্য জান্নাত।

- শহীদদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যবলী: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ১. তাকে তার রক্তের প্রথম ফোটা পতনের সাথে সাথে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হয়। ২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৩. কিয়ামতের মহা ত্রাস থেকে নিরাপদ রাখা হয়। ৪. তার মাথায় গাম্ভীর্যের মুকুট পরানো হবে, যার একেকটি ইয়াকুতী পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছু থেকে উত্তম। ৫. তাকে ৭২ জন আনত নয়না হুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। ৬. তার ৭০ জন নিকটত্মীয়ের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী রহ:)

- শহীদদের সর্ববৃহৎ মর্যাদা: রাসূল সা: বলেন: কেউ জান্নাতে প্রবেশ করে আর ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও তাকে দুনিয়ার সব কিছু দেওয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে কামনা করবে দুনিয়ায় ফিরে আসতে, অত:পর দশবার আল্লাহর রাস্তায় নিহত হতে। আর তা কেবল শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা প্রত্যক্ষ করার কারণেই। (বুখারী মুসলিম)
- জিহাদের মাঝে রয়েছে প্রকৃত জীবন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا للـــه وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান করে, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে, তখন তোমরা তাদের ডাকে সাড়া দাও।"

ইবনুল কাইয়্যিম রহ: বলেন: যে জিনিস মানুষকে দুনিয়া, কবর ও আখিরাতে জীবন দান করে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ হল জিহাদ।

দুনিয়ায় জীবন দান এভাবে যে: শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি ও ক্ষমতা জিহাদের মাধ্যমেই লাভ হয়।

আর কবরে জীবন লাভের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللـــه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা করো না, বরং তারা জীবিত। তাদের রবের নিকট তাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়।"

আর আখিরাতে জীবন লাভের স্বরূপ হল: আখিরাতে মুজাহিদ ও শহীদগণের জীবন ও নেয়ামত অন্যদের থেকে বেশি পরিমাণে ও উন্নতমানের হবে।

- মুজাহিদের মহা প্রতিদান: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: কারো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অবস্থান করা স্বীয় ঘরে ৭০ বছর নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। তোমরা কি

ভালবাসো না, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তাহলে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যে আল্লাহর পথে উষ্ট্রীর দুধ দোহন পরিমাণ সময় যুদ্ধ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী রহ:)

- জিহাদের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই: বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদের সমতুল্য কি আছে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা সেটা পারবে না। লোকটি এভাবে দু'বার বা তিনবার প্রশ্ন করল। তিনিও প্রতিবারই বললেন: তোমরা সেটা পারবে না। তারপর তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উদাহরণ হল, ধারাবাহিকভাবে রোজা পালনকারী ও রাত্রিজাগরণ করে নামাযে কুরআন তিলাওয়াতকারীর ন্যায়, যে রোজা ও নামাযে একটুও বিরতি দেয় না, যতক্ষণ না আল্লাহর পথের মুজাহিদ গৃহে ফিরে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

তাওবা হল জীবনের নিয়মিত আমল

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَتُوبُوا إِلَى اللــــه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো, হয়ত তোমরা কামিয়াব হতে পারবে।”

- আল্লামা সা'দী বলেন: যেহেতু মুমিনের ঈমানই তাকে তাওবার প্রতি আহ্বান করে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা এর উপর সফলতাকে সম্পৃক্ত করে বলেন: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “হয়ত তোমরা কামিয়াব হতে পারবে”। সুতরাং তাওবা ব্যতীত সফলতার কোন পথ নেই। আর তাওবা হচ্ছে: প্রকাশ্যে ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয় থেকে ফিরে এসে প্রকাশ্যে ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয় করতে শুরু করা। এটা প্রমাণ করে, প্রতিটি মুমিনেরই তাওবার প্রয়োজন

রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিনকে সম্ভোধন করেছেন। আর এখানে তাওবায় ইখলাস রাখার প্রতিও উৎসাহ রয়েছে। যেহেতু বলা হয়েছে- وَتُوبُوا إِلَى اللــه "তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো" অর্থাৎ অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়; যেমন দুনিয়াবী বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করা, মানুষকে দেখানো, সুখ্যাতি অর্জন করা ইত্যাদি ভ্রান্তি উদ্দেশ্য সমূহ।

- নবী সা: এর জীবনে তাওবার গুরুত্ব: আগর আল মুযানী রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: নিশ্চয়ই অনেক সময়ই আমার মনের ভুল হয়ে যেতে পারে, তাই আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)
- আমাদের তাওবা করার প্রয়োজনীয়তা: তাওবা হল জীবনে নিয়মিত আমল। এটা জীবনের শুরু ও শেষ। এটাই দাসত্বের নিম্নস্তর, মধ্যস্তর ও উচ্চস্তর। আমাদের তাওবার প্রয়োজন রয়েছে। বরং এর প্রয়োজন আমদের জীবেন অনেক বেশি। কারণ আমরা অনেক গুনাহ করি, আল্লাহর ব্যাপারে দিন-রাত অনেক সীমালঙ্ঘন করি। তাই আমাদের অন্তরকে গুনাহর মরিচা থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য তাওবা প্রয়োজন।
- প্রতিটি আদম সন্তানই ভুলকারী, গুনাহকারী। তবে সর্বোত্তম ভুলকারী হল তাওবাকারী। আর শেষের পূর্ণাঙ্গতাই ধর্তব্য, শুরুর অসম্পূর্ণতা ধর্তব্য নয়।
- সর্বাবস্থায় বেশি বেশি ইস্তেগফার করা: হাসান বসরী রহ: বলেন: তোমরা তোমাদের ঘরে, পানির ঘাটে, রাস্তায়, বাজারে, মজলিসসমূহে ও তোমরা যেখানেই থাক, সর্বদা বেশি বেশি আল্লাহর যিকর কর। কারণ তোমরা জান না, কখন আল্লহর মাগফিরাত নাযিল হয়।
- বেশি বেশি ইস্তেগফার করা: যে যিকরটি বেশি বেশি করা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে ইস্তেগফার। এর অনেক ফযীলত রয়েছে। এর বরকত অনেক ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে ইস্তেগফার করার আদেশ করে বলেন: (واستغفروا اللــه إن اللــه غفور رحيم) একদল লোক নিজেদের অন্যায় কর্ম থেকে ইস্তেগফার

করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللـــه فاستغفروا لذنوبهم)"এবং যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

- তুমি কিভাবে গুনাহর কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে? গুনাহরাশী গুনাহগারের ঘাড়ে শিকল হয়ে থাকে, সে তাওবা ব্যতীত তার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وما كان اللـــه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللـــه معذبهم وهم يستغفرون)

"এবং আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে আযাব দিবেন এবং তিনি এমনও নন যে, তারা ইস্তেগফারে রত অবস্থায় তাদেরকে আযাব দিবেন।"

- ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যে ইস্তেগফার আযাবকে প্রতিহত করে, তা হচ্ছে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে ফিরে আসার মাধ্যমে ইস্তেগফার করা। পক্ষান্তরে যে গুনাহর মধ্যে লিপ্ত থেকেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার ইস্তেগফার তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবে না। কারণ মাগফিরাত বা ক্ষমার অর্থ হচ্ছে, গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়া, তার চিহ্ন মুছে দেওয়া এবং তার অনিষ্ট দূর করা।
- গীবত থেকে তাওবা করার ক্ষেত্রে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য ইস্তেগফার করাই কি যথেষ্ট, নাকি তাকে অবগত করানোও আবশ্যক? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: এই মাসআলাটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দুই রকম মত রয়েছে। আর দু'টিই ইমাম আহমাদ রহ: থেকে বর্ণিত দুই মত। তা হচ্ছে গীবত থেকে তাওবা করার জন্য যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য ইস্তেগফার করাই কি যথেষ্ট, নাকি তাকে অবগত করানো ও তার থেকে মুক্ত হওয়াও আবশ্যক? তিনি বলেন: বিশুদ্ধ মত হল, তাকে অবগত করানো আবশ্যক নয়। তার জন্য ইস্তেগফার করা

এবং যে সকল মজলিসে তার গীবত করেছে, সেসকল মজলিসে তার সুনাম করাই যথেষ্ট।

- দু'আ অনেক সমস্যার সমাধান: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ)

"এবং (কিতাব এই পথনির্দেশ দেয় যে,) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, অত:পর তার অভিমুখী হও। তিনি তোমাদেরকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন ভোগ করতে দিবেন এবং যে কেউ বেশি আমল করবে, তাকে নিজের পক্ষ থেকে বেশি প্রতিদান দিবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের শাস্তি আশঙ্কা করি।"

নূহ আলাইহিস সালামের যবানীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)

"আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন।"

- বিশর বলেন: আমি ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনলাম: আল্লাহ তা'আলা এমন রোগের প্রতি ক্রোধ পোষণ করেন, যে রোগের কোন চিকিৎসা নেই। তখন আমি বললাম: তার চিকিৎসা হল শেষ রাতে অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা এবং শিক্ষামূলক তাওবা করা।

- শায়খুল ইসলাম বলেন: যে অস্থিরকারী বিপদে আক্রান্ত হয়, তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল, শক্তভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা , সর্বদা দু'আ ও মিনতি করা। হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আ শিখবে, অত:পর কবুল হওয়ার সম্ভাব্য সময়গুলোতে, যেমন শেষ রাতে, আযান-ইকামতের সময়, সিজদার সময়, নামাযের পরে, ইত্যাদি সময়গুলোতে মনোযোগ সহকারে বেশি বেশি দু'আ করবে এবং তার সাথে ইস্তেগফারও যুক্ত করবে।
- জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ বলেন: হে সুফিয়ান! যখন আল্লাহ তোমাকে কোন নেয়ামত দান করেন, অত:পর তুমি চাও, তা সর্বদা স্থায়ীভাবে তোমার জন্য থাকুক, তাহলে তুমি তার জন্য বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা ও শুকর আদায় কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন: (لئن شكرتم لأزيدنكم) "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিব।"
- যখন তুমি রিযিক আসতে বিলম্ব দেখছো, তখন বেশি বেশি ইস্তেগফার কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেছেন:

  (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم
  بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)

  "নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন।"
- তাওবার শর্তাবলী: তাওবার কালিমা একটি মহান কালিমা। এর রয়েছে গভীর তাৎপর্য। অনেকে যেমনটা মনে করে- শুধু মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ করে কার্যত উক্ত গুনাহই চালিয়ে যেতে থাকা- এমনটা নয়।কারণ মূল্যবান জিনিসের জন্য অনেক শর্ত থাকে। তাই উলামায়ে কেরাম তাওবার জন্য অনেকগুলো শর্ত উল্লেখ করেছেন, যেগুলো কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে তার কিছু আলোচনা করা হল:

১. তৎক্ষণাৎ উক্ত গুনাহ থেকে ফিরে আসা।

২. পূর্বে যা হয়ে গেছে, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

৩. সামনে আর না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা।

৪. যাদের প্রতি জুলুম করেছে, তাদের হক ফিরিয়ে দেওয়া বা তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

কেউ আরেকটি বৃদ্ধি করেছেন: এ সবের মধ্যে ইখলাস রাখা।

- ইবনে রজব বলেন: শুধু اللـــهمّ اغفر لي (হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর) বলাই ক্ষমা প্রার্থনা এবং দু'আও। এর হুকুম হবে অন্য সকল দু'আর মতই। এক্ষেত্রে আল্লাহ চাইলে তার দু'আ কবুল করবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন। বিশেষত: যদি স্বীয় গুনাহের জন্য ভগ্ন হৃদয়ের সাথে হয় এবং কবুলের সময়গুলোতে হয়, যেমন সাহরীর সময়, নামাযের পরে।
- লোকমান আ: থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার সন্তানকে বলেন: হে বৎস! তোমার যবানকে সর্বদা اللهمّ اغفر لي কথাটি বলতে অভ্যস্ত কর। কারণ আল্লাহর কিছু সময় রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ কারো দু'আ ফিরিয়ে দেন না।
- তাওবায় সহায়ক বিষয়সমূহ:

১. ইখলাস রাখা ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা: যখন মানুষ আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় এবং সত্যিকার অর্থে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তাতে সাহায্য করেন এবং তার জন্য তা সহজ করে দেন।

২. আশা কম করা ও পরকালকে স্মরণ করা: যখন মানুষ দুনিয়ার সীমাবদ্ধতা ও দ্রুত ধ্বংস হওয়ার কথা চিন্তা করবে, অনুধাবন করবে যে, এটা হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র এবং নেক আমল অর্জন করার সুবর্ণ সুযোগ আর জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত ও জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে স্মরণ করবে, তখন সে দীর্ঘ দিনের প্রবৃত্তির পথ থেকে ফিরে আসবে, শিক্ষণীয় তাওবায় অনুপ্রাণিত হবে এবং সামনে নেক আমলের মাধ্যমে অতীত কর্মের ক্ষতিপূরণ করতে চাইবে।

৩. গুনাহর উদ্দীপক ও স্মারক বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকা: যেসকল জিনিস গুনাহর প্রেরণা ও মন্দের আগ্রহ সৃষ্টি করে তা থেকে দূরে থাকবে। যেসকল

জিনিস প্রবৃত্তিকে নাড়া দেয় এবং গোপন রিপু জাগিয়ে তুলে- যেমন নগ্ন ফিল্ম দেখা, মাতাল গান-বাদ্য শ্রবণ করা, অশ্লীল বই-পুস্তক ও ম্যাগাজিন পাঠ করা, ইত্যাদি থেকে দূরে থাকবে।

৪. ভাল লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা, দুষ্ট লোকদের থেকে দূরে থাকা: সৎ সঙ্গী তোমাকে উপদেশ দিবে, তোমার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিবে। আর অসৎ সঙ্গী মানুষের দ্বীন নষ্ট করে দেয়, সাথীর দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয় না, দুষ্টদের সাথে তার সম্পর্ক করে দেয়, ভাল লোকদের থেকে সম্পর্ক বিছিন্ন করে এবং তাকে লাঞ্ছনা, অপমান ও লজ্জার পথে পরিচালিত করে।

আল্লাহর ওলীগণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(ألا إن أولياء اللـــه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اللـــه ذلك هو الفوز العظيم)

"স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দু:খিতও হবে না। তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনও পরিবর্তন হয় না। এটাই মহা সাফল্য।"

- ইমাম তবারী রহ: বলেন: মহান আল্লাহ এখানে বলছেন: জেনে রাখ, আল্লাহর সাহায্যকারীদের আখেরাতে আল্লাহর শাস্তির কোন ভয় নেই। কারণ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, তাই আল্লাহ তাদেরকে তার শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর তারা দুনিয়ায় যা কিছু হারিয়েছে, তার জন্যও দু:খিত হবে না।
- ওলী কে?

শায়খুল ইসলাম বলেন: যে ই মুমিন ও মুত্তাকী হয়, সে ই আল্লাহর ওলী।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: আল্লাহর ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে, সর্বদা তার আনুগত্য করে এবং ইখলাসের সাথে তার ইবাদত করে।

- কিভাবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যাবে: শায়খুল ইসলাম বলেন: যেহেতু মুমিন ও মুত্তাকীগণই আল্লাহর ওলী, সেহেতু বান্দার ঈমান ও তাকওয়ার পরিমাণ হিসাবেই আল্লাহর সাথে তার ওয়ালায়াত (বন্ধুত্ব) হবে। তাই যে সবচেয়ে বেশি ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী, আল্লাহর সাথে তার বন্ধুত্বও সর্বাধিক হবে। সুতরাং ঈমান ও তাকওয়ার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেই আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হয়।
- আল্লাহর ওলীদের বৈশিষ্ট্যাবলী: শায়খুল ইসলাম বলেন: যার ভালবাসাও আল্লাহর জন্য, ঘৃণাও আল্লাহর জন্য, শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসে, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করে আবার আল্লাহর জন্যই কাউকে নিষেধ করে- এমন ব্যক্তির অবস্থাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীদের অবস্থা।

  ওলী ততক্ষণ পর্যন্ত ওলী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর শত্রুদেরকে ঘৃণা করে, তাদের সাথে শত্রুতা করে এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই তাদের সাথে শত্রুতা ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হল, তার ওলায়াতের পূর্ণাঙ্গতা ও বিশুদ্ধতার চাবিকাঠি।

- আল্লাহর ওলীদের বিভিন্ন স্তর: শায়খুল ইসলাম বলেন: আল্লাহর ওলীদের দু’টি স্তর রয়েছে। একটি হল, অগ্রগামী ও নৈকট্যশীলদের স্তর। আর আরেকটি ডানপন্থী ও মধ্যপন্থী নেককারদের স্তর। আল্লাহ তা’আলা তার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে তাদের কথা আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা ওয়াকিয়ার শুরুর দিকে এবং শেষের দিকে। আল্লাহ ত’আলা বলেন:

  (وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين)

“এবং (হে মানুষ!) তোমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। সুতরাং যারা ডান হাত বিশিষ্ট, আহা, কেমন যে সে ডান হাত বিশিষ্টগণ! আর যারা বাম হাত বিশিষ্ট, কী (হতভাগ্য) সে বাম হাত বিশিষ্টগণ! আর যারা অগ্রগামী, তারা তো অগ্রগামীই। তারাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।”

- ওলায়াতের প্রকারভেদ: শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেন: ওলায়াত দুই প্রকার:

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওলায়াত।

২. বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর ওলায়াত।

প্রথমটির দলীল হল: আল্লাহ তা’আলার বাণী: (الله ولي الذين آمنوا) “আল্লাহই ঈমানদারদের বন্ধু (অভিভাবক)”। আর দ্বিতীয়টির দলীল হল আল্লাহ তা’আলার বাণী: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا) (“আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে...”)

অত:পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি ওলায়াত আবার দুই প্রকার:

১. ব্যাপক ওয়ালায়াত।

২. বিশেষ ওয়ালায়াত।

ব্যাপক ওয়ালায়াত হল, বান্দার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ওয়ালায়াত (অভিভাবকত্ব)। এটা মুমিন-কাফের সহ সমস্ত সৃষ্টিজীবকেই অন্তর্ভূক্ত করে। তাই আল্লাহই বান্দাদের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, শাসন ইত্যাদি করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين)

“অত:পর সকলকে তাদের প্রকৃত মুনিবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। স্মরণ রেখ, হুকুম কেবল তারই চলে। তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।”

বিশেষ ওয়ালায়াত: তা হচ্ছে আল্লাহ তার বিশেষ মনোযোগ, তাওফীক ও হেদায়াতের মাধ্যমে বান্দার দায়িত্বভার গ্রহণ করা। এটা শুধু মুমিনদের সাথেই নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(اللـه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات)

"আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর কাফেরদের অভিভাবক হল শয়তান। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

(ألا إن أولياء اللـه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون)

"স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দু:খিতও হবে না।"

- আল্লাহর ওয়ালায়াত কিভাবে লাভ করা যায়? একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমেই আল্লাহর ওয়ালায়াত লাভ করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যে স্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর দাসত্বে লেগে থাকে। আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত ওয়ালায়াত লাভ করা যায় না।

- আল্লাহর তা'আলার দাবিসমূহ:
  - আল্লাহকে শাসকরূপে গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন: أَفَغَيْرَ اللـه أَبْتَغِي حَكَماً "আমি কি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ করবো।" আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সকল বিষয়ের শাসনকারী রূপে গ্রহণ করা যাবে না।
  - শুধু আল্লাহর জন্যই কুরবানী করা: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للـه رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ)

- "বল, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যার সাথে কোন শরীক নেই"।

  সুতরাং যে ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে কিছুতেই আল্লাহর ওলী হতে পারে না। কারণ তার ওলী হলে কিভাবে তার সাথে শরীক করতে পারে?
- সকল বিষয়ে ও সকল অবস্থায় আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। যখন তোমার আল্লাহর সাথে ওয়ালায়াত বিশুদ্ধ হবে, তখন তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীন ভালোভাবে আকড়ে ধরতে হবে এবং মানুষ দ্বীনের মধ্যে যত বিদআত সৃষ্টি করেছে, তা বর্জন করতে হবে।
- আল্লাহর প্রিয়দেরকে ভালবাসা: আল্লাহর প্রিয়দেরকে ভালবাসতে হবে, আল্লাহর ওলীদেরকে ভালবাসতে হবে এবং ওই সকল লোকদের সাথে শত্রুত করতে হবে, যারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে, বিদ্বেষ পোষণ করে।
- আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করা: কারণ এই ওয়ালায়াত তোমার উপর অনেক গুরুদায়িত্ব আরোপ করে। তোমাকে তোমার জীবনের কষ্টে ফেলবে, সম্পদের কষ্টে ফেলবে, দেশ থেকে দূরে থাকার কষ্টে ফেলবে।
- আল্লাহর শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

  "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই মধ্য থেকে হবে।"
- বর্তমানে অনেক মুসলিম আছে, যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ও পারস্পরিক সাহায্যের জন্য জোট গঠনের দিকে দৌঁড়ে যায়। তাহলে কিভাবে

একজন বান্দার অন্তরে একসাথে বিপরীতমূখী দু'টি বিষয় একত্রিত হতে পারে!?

- পরিপূর্ণভাবে সতর্ক থাক: জনৈক সালাফ বলেন: প্রকাশ্যে আল্লাহর ওলী আর গোপনে তার শত্রু হয়ো না।

- তুমি কি আখেরাতের চিন্তা মাথায় রাখ?

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

"এই পার্থিব জীবন খেলা-ধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!"

- ইমাম বাগাবী রহ: বলেন: اللهو হল: দুনিয়াবী স্বাদের জিনিস শ্রবণ করা। আর اللعب হল: অনর্থক কাজ। দুনিয়াকে এ দু'টি নামে ভূষিত করা হয়েছে যেহেতু দুনিয়া একটি ধ্বংসশীল ও নশ্বর বস্তু। আর পরকালীন জগতই হল স্থায়ী জীবনের জগত। আয়াতে الْحَيَوَانُ অর্থ হায়াত। অর্থাৎ চিরস্থায়ী হায়াত লাভ হবে। 'যদি তারা জানতো' দুনিয়ার ধ্বংসশীলতা ও আখেরাতের স্থায়িত্ব।
- বহুরূপী চিন্তা: মানুষ চিন্তামুক্ত নয়। চিন্তা দুই প্রকার: দুনিয়ার চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা। কেউ এর একটি থেকে মুক্তি হলে আরেকটি থেকে মুক্তি হতে পারবে না। আর গাফেল হল, যার চিন্তা দুনিয়া নিয়ে। জ্ঞানী হল, যার চিন্তা আখেরাত নিয়ে। তাই মানুষ এ দু'টি চিন্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় কোন চিন্তা নেই।
- দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তার ফলাফলসমূহ: নবী সা: বলেন: যার চিন্তা আখেরাত, আল্লাহ তার সকল বিস্তৃত চিন্তাগুলোকে একীভূত করে দেন, তার অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করেন এবং দুনিয়া তার নিকট লাঞ্ছিত হয়ে আসে। আর যার চিন্তা দুনিয়া, আল্লাহ তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার চোখের সমানে দরীদ্রতা ঢেলে দেন

আর দুনিয়া তার জন্য যতুটুকু লেখা ছিল, ততটুকুই তার লাভ হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ)

- আখিরাত চিন্তার ফলাফলসমূহ: আখেরাতের চিন্তা থেকে সৃষ্টি হয় দাওয়াত, আমর বিল মারুফ, নেহী আনিল মুনকার ও মানুষের মাঝে সংশোধনের চিন্তা। কারণ যাকে আখেরাতের চিন্তা ব্যস্ত রাখে, সর্বদা জান্নাত লাভের আগ্রহ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টায় থাকে এবং স্বীয় দ্বীন থেকে কল্যাণের ভালবাসা শিখে, সে তো এমনই হবে।

  রাসূল সা: বলেন: আমি জান্নাত অন্বেষণকারী ও জাহান্নাম থেকে পলায়নকারীদের মত ঘুমন্ত আর কাউকে দেখিনি। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী)

- দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের অবস্থা: সালাফগণ (রা:) দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক হতেন, ক্রয়-বিক্রয়ও করতেন, কিন্তু দুনিয়া শুধু তাদের সামনেই থাকত; তাদের অন্তরে থাকত আখেরাত। কিন্তু এটা বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থার বিপরীত। তাদের অন্তর পার্থিব ভোগ-সম্ভার, বিপদাপদ, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসায় ভরপুর থাকে। ফলে তাদের আখেরাতের চিন্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের চলাফেরায় ইবাদতের প্রভাব-চিহ্ন ম্লান হয়ে পড়েছে এবং তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা ক্ষীণ হয়ে গেছে।। তারা তাদের সময়, মনোযোগ ও সম্পদের উদ্ধৃত অংশগুলোকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে।

- কখন তোমার অন্তর থেকে দুনিয়ার চিন্তা দূর হবে?

  ইমাম মালেক রহ: বলেন: তুমি যতটুকু পরিমাণ দুনিয়ার জন্য চিন্তিত হবে, তোমার অন্তর থেকে ততটুকু আখেরাতের চিন্তা বের হয়ে যাবে। আর তুমি যতটুকু পরিমাণ আখেরাতের চিন্তা করবে, তোমার অন্তর থেকে ততটুকু পরিমাণ দুনিয়ার চিন্তা বের হয়ে যাবে।

  কারণ অন্তর যখন দুনিয়া ও তার চিন্তায় ভরপুর হয়ে যায়, তার মধ্যে আখেরাত ও আখেরাতের প্রস্তুতির চিন্তা দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে মহান আল্লাহর

কালাম চিন্তা করার মত স্থান থাকে না। সুতরাং আখেরাতের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়াই সব কল্যাণের মূল।

ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: জেনে রাখ, যখন অন্তর দুনিয়ার চিন্তা ও তার সাথে সম্পৃক্ততা- তথা সম্পদ, নেতৃত্ব, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর আখেরাতের চিন্তা ও তার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তখনই কেবল সে কল্যাণের পথে চলতে পারবে।

- আল্লাহর নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি: আর এটাই সকল প্রকার সফলতার চাবিকাঠি, আলোর উৎস। তখনই তার অন্তর আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়গুলো জানার জন্য জেগে উঠবে এবং তা সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকবে। আর এটাই তার সদিচ্ছার আলামত।
- সালাফদের আখেরাত চিন্তার কিছু নমুনা: সুফিয়ান সাওরী রহ: বলেন: আমি একরাত পর পর সুফিয়ানের চোখে সুরমা দিয়ে দিতাম। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জেগে উঠে জোরে জোরে বলতেন: আগুন... আগুন...। জাহান্নামের স্মরণ আমাকে ঘুম ও জীবনভোগ করতে দিচ্ছে না।
- ইবনে মাসুদ রা: এক কামারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন এই আগুন দেখে তার অন্তরে ভয় জাগল। তিনি লোহার নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন। লোহা উত্তপ্ত হত। তা দেখে তিনি আখেরাতের স্মরণে কাঁদতেন। সাহাবা ও সালাফগণ এরূপই ছিলেন।
- জীবনের প্রতিটি সময়কে গনিমত মনে করতেন: জনৈক যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী) বলেন: আমি এমন কারো কথা ভাবতে পারি না, যে জান্নাত-জাহান্নামের কথা শোনার পরও তার একটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্য, তথা যিকর, নামায, কুরআন তিলাওয়াত বা ইহসান ব্যতীত কাটাবে। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল: আমি সবচেয়ে বেশি কাঁদি। তিনি বললেন: তুমি যদি হাস, কিন্তু তোমার গুনাহকেও

স্বীকার কর, তাহলে এটাই উত্তম, কেঁদে নিজের আমল মানুষকে বলার চেয়ে। আমল প্রচারকারী ব্যক্তির আমল তার মাথার উপরেই উঠে না।

- তখন উক্ত লোকটি বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তুমি দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও, যেমন তারা আখেরাতকে আখেরাতকামীদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। আর দুনিয়াতে মধু পোকার ন্যায় হয়ে থাক। যা খেলে উত্তম জিনিস খায়, খাওয়ালে ভাল জিনিস খাওয়ায় আর কোন কিছুর উপর পড়ে গেলে তাকে ভাঙ্গে না বা তাতে ক্ষত সৃষ্টিও করে না।
- আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের চিন্তা:

তোমার সব চিন্তাকে এক চিন্তায় রূপান্তর কর: আর তা হল আখেরাতে চিন্তা, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের চিন্তা এবং তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার চিন্তা।

বান্দা স্মরণ করবে যে, সে আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে, আরও স্মরণ করবে যে, প্রত্যেক শুরুরই শেষ আছে, মৃত্যুর পর তার তাওবার কোন সুযোগ নেই এবং মৃত্যুর পর জান্নাত-জাহান্নাম ছাড়া কোন বাসস্থান নেই। সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করবে, জীবন শেষ হয়ে যাবে, ভোগ-সামগ্রী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এগুলো হল ধোঁকা ও চোখের পর্দা, তখন আল্লাহর শপথ! এই স্মরণই তাকে দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে এবং সত্য ও আন্তরিকভাবে দুনিয়ার রবের দিকে মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। তখন তার হৃদয় বিগলিত হবে। যখন সে কবরগুলোর দিকে দৃষ্টি দিবে এবং কবরবাসীদের অবস্থা চিন্তা করবে, তখন তার অন্তর ভেঙ্গে যাবে। আর তার অন্তর হবে কঠোরতা ও প্রবঞ্চনা থেকে সর্বাধিক মুক্ত। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়!

তোমার অন্তর কি আখেরাতের চিন্তায় ব্যস্ত হয়, নাকি তুমি আখেরাত ভুলেই গেছো? ফলে ঐ সকল লোকদের মত হয়ে গেছো, যারা নামায পড়েও পড়ে না, মাথা ঠোকর দেয়, কিন্তু জানে না, কি নামায পড়ছে, ইমাম কি কিরাত পাঠ করেছে! একটি দিনও এমন স্মরন করতে পারে না, যাতে কুরআন পাঠে হৃদয় প্রকম্পিত হয়েছে?

- যারা আখেরাতের চিন্তা লালন করে তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী:

১. আত্ম সংশোধন: এটাই তাদের দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক আল্লাহর ইবাদত করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা। তারা জানে, আল্লাহ দয়া করেন, ক্ষমা করেন, মার্জনা করেন, কিন্তু তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকে না, বরং ছোট থেকে ছোট প্রতিটি গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা-অলসতার জন্য অনুতপ্ত হয়। কারণ তারা জানে, যে সত্তার নাফরমানী করা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ। আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা মুসলিমদের বিপদাপদ ও তাদের উপর আপতিত জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে চিন্তিত। তাদের অন্তর দয়া ও করুণায় ভরা থাকে। সেই আখেরাত চিন্তার কারণে, যা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

২. সার্বক্ষণিক হিসাব-নিকাশ: পরকালীন চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন, সর্বদা নিজের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নিকাশ করে।

৩. হাসান বসরী রহ: আল্লাহর বানী- وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ("এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের") এর তাফসীরে বলেন: আল্লাহর শপথ! এটা হচ্ছে মুমিনের নফ্স। প্রতিটি মুমিনই নিজেকে ভর্ৎসান করতে থাকে: আমার একথাটির উদ্দেশ্য কি? আমার এই ভাবনাটির উদ্দেশ্য কি? কিন্তু পাপাচারী নিজের হিসাব করে না।

কিন্তু এই চিন্তা ও মুরাকাবা (আত্মসমালোচনা) তাদেরকে এমন শিকলে বেঁধে ফেলে না যে, মসজিদের কোণায় বা ঘরে বসে বসে শুধু নিজের জন্য কাঁদতে থাকবে আর ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের ব্যাপারে ভাববে না, তাদেরকে সংশোধন করবে না, নিজের আশপাশের লোকদের মন্দ কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করবে না। বরং তাদের অন্তরে যে চিন্তা থাকবে, তা ই তাদেরকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে নিজের লোকদেরকে সংশোধন করবে, অন্যদেরকে সংশোধন করবে এবং বিপদাপদ ও কষ্ট-মুসিবত সহ্য করবে।

- মৃত লোকদের দৃশ্য ও তাদের অবস্থা দেখে তাদের শিক্ষা গ্রহণ: তারা তাদের জীবন্ত অন্তরের কারণে প্রতিটি দুনিয়াবী বিষয়কে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত করবে। অন্যদের মৃত্যু তাদেরকে নিজেদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। ফলে তা তাদের পরকালীন আমলের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলবে। তারা পরকালের জন্য আমল সঞ্চয় করতে থাকবে, যা তাদেরকে জান্নাতের উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে।
- আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللـــه واللـــه هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

"হে লোক সকল! তোমরাই আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং আপনিই প্রশংসিত।"

শাওকানী রহ: বলেন: অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ে তার দিকে মুখাপেক্ষী। ফলে সার্বিকভাবেই তার দিকে মুখাপেক্ষী।

- প্রকৃত দারিদ্র্য কি? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: প্রকৃত দারীদ্র্য হল, প্রতিটি অবস্থায় সর্বদা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা এবং বান্দা প্রকাশ্যে ও আন্তরিকভাবে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী হিসাবে দেখা।
- অধিকাংশ মানুষের অবস্থা: প্রতিটি মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ে আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী। অথচ বর্তমানে মানুষ মানুষের পিছনে লেগে থাকে, মানুষের নিকট অভিযোগ পেশ করে। তবে যে বিষয়ে মানুষ সক্ষম, সে বিষয়ে মানুষের সাহায্য চাইলে সমস্যা নেই, কিন্তু মানুষের উপর ভরসা করা, তাদের নিকট ভিক্ষা করা, তাদের পিছনে লেগে থাকা, এগুলোই হল ধ্বংস। কারণ যে আল্লাহর ব্যতিত কোন কিছুর পিছনে ছুটে, তাকে তার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমরা আত্মগর্ব ও আত্মপ্রবঞ্চনা বশত নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর ভরসা করে ফেলি! অথচ আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট সাহয্য ও তাওফীক চাওয়া, তার নিকট বারবার দু'আ করা এবং যেকোন সংকটে বা সচ্ছলতায় একমাত্র তার সাথে সম্পর্ক গড়া । কিন্তু কিছু মানুষ এই চিন্তা করে সবকিছুর শেষে।

- আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষীতা প্রকাশের স্বাদ: স্বীয় প্রতিপালকের সামনে ভেঙ্গে পড়া, তাকে ডাকা ও তার নিকট দু'আ করার মাঝে রয়েছে অবর্ণনীয় স্বাদ।
- জনৈক আল্লাহ ওয়ালা বলেন: আল্লাহর নিকট আমার একটি প্রয়োজন থাকবে আর আমি তার নিকট তা চাইবো, ফলে আমার জন্য মুনাজাত ও মারিফাত লাভ করা এবং বিনয় ও ভগ্নদশা প্রকাশ করার সুযোগ হবে- আমার নিকট আমার এমন অবস্থা সর্বদা থাকা আর আমার প্রয়োজনটি পুরা হতে বিলম্বিত হওয়া অনেক ভাল।
- আল্লাহর দিকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ: সাহল আত-তাসতারী বলেন: বান্দা ও তার রবের মাঝে সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত পথ হল 'দীনতা প্রকাশ করা।
- রহমতের দরজাসমূহ কখন খুলে দেওয়া হয়? শায়খুল ইসলাম বলেন: যখন বান্দা আল্লাহর নিকট সত্যিকারার্থে মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করে এবং একনিষ্ঠভাবে তার নিকট সাহায্য চায়, তখন আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন, তার দু:খ দূর করে দেন এবং তার জন্য রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন। আর এমন ব্যক্তিই তাওয়াক্কুল ও দু'আর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে, যা অন্যরা আস্বাদন করতে পারে না।
- আল্লাহর নিকট উসিলা পেশ করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সর্বোত্তম: বান্দা সর্বোত্তম যে জিনিসের দ্বারা আল্লাহর নিকট ওসিলা পেশ করবে, তা হল সর্বাবস্থায় তার নিকট মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা, সকল কাজে দৃঢ়ভাবে সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং হালাল পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করা।
- কিভাবে তুমি তোমার প্রয়োজন পুরা করবে?

ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যে ব্যর্থ হয়েছে সে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এবং দু'আ ও দীনতা প্রকাশে অবহেলা করার কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। আর আল্লাহর

ইচ্ছা ও সাহায্যে যে সফল হয়েছে, সে কেবল শুকর আদায় এবং সর্বান্তকরণে দু'আ ও মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করার কারণেই সফল হয়েছে।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: আমি শায়খুল ইসলামকে দেখেছি, তিনি যখন বিভিন্ন মাসআলা বুঝতেন না বা কঠিন মনে করতেন, তখন দ্রুত তাওবা, ইস্তেগফার, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও কাকুতি মিনতি করতে চলে যেতেন। আল্লাহর নিকট সঠিক সিদ্ধান্ত কামনা করতেন এবং তার রহমতের খাযানাসমূহ খোলার দু'আ করতেন। অত:পর অল্প সময়ের মধ্যেই তার উপর অবারিত ইলাহী রহমত নাযিল হত। একটির পর একটি আল্লাহর সাহায্য এমনভাবে আসতে থাকত যে, তিনি কোনটা দিয়ে শুরু করবেন!?

- আউযু বিল্লাহ বলার মধ্যেও দীনতা প্রকাশ রয়েছে: আউযু বিল্লাহর মধ্যে পরিপূর্ণ দীনতা প্রকাশ, আল্লাহকেই আকড়ে ধরা, আল্লাহই যথেষ্ট হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ছোট-বড়, মানব বা অমানবসৃষ্ট সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহকেই যথেষ্ট করার বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর দলীল হল আল্লাহর বাণী- (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق....)

"বল, আমি ভোরের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। এবং সেই সব ব্যক্তির অনিষ্ট হতে, যারা (তাগা বা সুতার) গিরায় ফুঁ দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।"

(قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس....)

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের। সমস্ত মানুষের অধিপতির। সমস্ত মানুষের মাবুদের। সেই কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে পেছনে আত্মগোপন করে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে।"

দু'আর মধ্যে দৃঢ়তা থাকা এবং ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত না করার আবশ্যকীয়তা: কারণ এটা কাঙ্খিত বিষয়টির গুরুত্ব না থাকা এবং আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশে দুর্বলতা বোঝায়। উদাহরণত: এমন বলবে না- হে আল্লাহ আপনি চাইলে আমাকে তাওফীক দান করুন! অথবা কাউকে বললেন: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যদি তিনি চান। অথবা এরূপ বলা: আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দিবেন যদি তিনি চান। বরং দৃঢ়ভাবে দু'আ করবে, তাতে ইংশাআল্লাহ তথা যদি আল্লাহ চান, এরূপ শব্দ ব্যবহার করবে না। নবী সা: বলেন: তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে: হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে আমার প্রতি রহম করুন, আপনি চাইলে আমাকে রিযিক দান করুন! বরং দৃঢ়ভাবে চাইবে। কারণ তিনি তো যা নিজে ইচ্ছা করেন, তা ই দিবেন; তাকে তো কেউ বাধ্যকারী নেই। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম)

- যে বিষয়টি সকল ইবাদতের মাঝে পাওয়া যায়: অন্তরিক ও বাহ্যিক সকল আমলগুলোর ব্যাপারে কেউ চিন্তা করলে দেখবে, সবগুলোর মধ্যেই আল্লাহর প্রতি দীনতা প্রকাশ করার বিষয়টি রয়েছে। তাই এটা সকল ইবাদতের সমন্বয়ক। সুতরাং ইবাদতের মধ্যে বান্দার দীনতা প্রকাশের পরিমাণ অনুযায়ী তার অন্তরে তার প্রভাব পড়বে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য উপকারী হবে। আপনি শুধু সর্ববৃহৎ কার্যগত ইবাদত, নামাযের মধ্যেই চিন্তা করুন, নামাযে বান্দা তার রবের সামনে শান্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত, বিনয়ী ও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে, সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখে। আর শুরু করে তাকবীরের মাধ্যমে।
- আল্লাহর নিকট দীনতা প্রকাশ আল্লহর প্রতি ঈমানকে শক্তিশালী করে।
- কিভাবে আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা যায়? দীনতা প্রকাশ একটি উদ্দীপক। তা বান্দাকে সর্বদা তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকতে প্রেরণা দেয়। আর এই দীনতা প্রকাশ কতগুলো জিনিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়:
- সৃষ্টিকর্তার বড়ত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করা: যখনই বান্দা আল্লাহর ব্যাপারে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে সর্বাধিক জানবে, তখন সে আল্লাহর সামনে সর্বাধিক দীনতা প্রকাশকারী ও বিনয়ী হবে।

- মাখলুকের দুর্বলতা ও অক্ষমতার উপলব্ধি: কেউ যখন নিজেকে পরিমাপ করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে, সে সম্মান, ক্ষমতা ও সম্পদে যে স্থানেই পৌঁছে যাক না কেন, তবু সে দুর্বল, অক্ষম, নিজের ভাল-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই তার, তখন সে নিজেকে ছোট মনে করবে, তার অহংকার শেষ হয়ে যাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নম্র হয়ে পড়বে, তার মনিবের সমীপে দীনতা প্রকাশ এবং তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি বৃদ্ধি পাবে।
- আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশের আলামতসমূহ:

    ১. আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ বিনয়ী হওয়া, সাথে সাথে সর্বোচ্চ ভালবাসাও রাখা।
    ২. আল্লাহ ও তার প্রিয় বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়া।
    ৩. সব সময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর ও ইস্তেগফারে থাকা।
    ৪. নেক আমল কবুল না হওয়ার আশংকায় থাকা।
    ৫. গোপনে-প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা।
    ৬. আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহকে বড় মনে করা।
- আল্লাহর সামনে বিগলিত হয়ে যাওয়ার স্বাদ: যেসকল বিষয়গুলো ঈমানকে সতেজ করে, তার মধ্যে রয়েছে, আল্লাহর সাথে নির্জনে কথা বলা ও বিগলিত হওয়ার স্বাদ। এজন্যই রাসূল সা: বলেছেন: বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় সিজদার সময়। কারণ সিজদার অবস্থার মধ্যে যে বিনয় রয়েছে, তা অন্যান্য অবস্থায় নেই। এর মধ্যে এমন ভগ্নাবস্থা ও নম্রতা রয়েছে, যা অন্যান্য অবস্থায় নেই। একারণেই বান্দা সিজদাবস্থায় আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। যেহেতু সিজদায় কপাল যমীনে রাখে, অথচ কপালই তার সবচেয়ে উপরের অঙ্গ। কার জন্য এটা যমীনে রাখে? আল্লাহর জন্য। এজন্যই এটা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটর্তী অবস্থা।
- আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাতে এই কথাগুলো কতই না মধুর! ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: এই অবস্থায়, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালার সামনে বিগলিত ও নত হওয়ার অবস্থায় এই কথাগুলো বলা কতই না মধুর:
  আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার সম্মান ও আমার হীনতার উসিলা দিয়ে, আপনি অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করুন! আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার

শক্তি ও আমার দুর্বলতার উসিলা দিয়ে, আমার থেকে আপনার অমুখাপেক্ষিতা ও আপনার প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতার উসিলা দিয়ে! আপনার সকাশে লুটিয়ে দিচ্ছি এই মিথ্যাবাদী ও অপরাধীর ললাট! আমি ছাড়াও আপনার অনেক গোলাম রয়েছে, কিন্তু আপনি ছাড়া আমাদের কোন মনিব নেই! আপনি ছাড়া কোন আশ্রয় ও কোন ঠিকানা নেই। আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এক হতদরীদ্রের ন্যায়। আপনার নিকট মিনতি করছি এক অনুগত ও নত বান্দার ন্যায়! আপনাকে ডাকছি এক ভীত-সন্ত্রস্ত ফরিয়াদির ন্যায়, যার ঘাড় আপনার সামনে নুয়ে পড়েছে, যার নাক আপনার সামনে ধুলোমলিন হয়েছে, যার চক্ষুদ্বয় আপনার সামনে প্লাবিত হয়েছে এবং যার হৃদয় আপনার সামনে বিগলিত হয়েছে।

- কিভাবে আমাদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব স্থাপন করবো?

আল্লাহর তা'আলার বড়ত্বের একটি নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে তাঁর পবিত্র সত্ত্বার ব্যাপারে বলেছেন:

وَمَا قَدَرُوا اللـــه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহকে তার যথোচিত মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়মাতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোর ভিতর এবং আকাশমন্ডলী গুটানো অবস্থায় থাকবে তার ডান হতে। তিনি পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে, তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।"

রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: কিয়মাতের দিন আল্লাহ তা'আলা যমীনকে তার মুষ্ঠিতে নিবেন আর সমস্ত আসমানসমূহকে তাঁর ডান হাতে নিবেন, অত:পর বলবেন: আমিই একমাত্র বাদশা। দুনিয়ার বাদশারা এখন কোথায়!!? (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

- গভীর প্রজ্ঞাবানী: শায়খুল ইসলাম বলেন: বান্দার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব থাকা তাঁর সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান করার দাবি করে। আর তার সম্মানিত

বিষয়সমূহকে সম্মান করা তার মাঝে ও গুনাহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। তাই যারা দু:সাহসিকভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজসমূহ করে, তারা আল্লাহর যথাযথ বড়ত্ব বুঝেনি।

- এই মহা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা কর:

এই বিশাল সৃষ্টি- আসামন, যমীন, পাহাড়, বৃক্ষ, পানি, মাটি ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কিয়মাতের দিন তার আঙ্গুলে রাখবেন এবং উভয় মুষ্ঠিতে জমা করবেন। যেমনটা বিশুদ্ধ দলিলাদী দ্বারা প্রমাণিত।

তাই এটাই আল্লাহ তা'আলা বড়ত্বের প্রমাণ দেয়: এই বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিকট ক্ষুদ্র হওয়াই তার বড়ত্ব, মহত্ব ও পরাক্রমের প্রমাণ বহন করে। একারণেই মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন: (وَمَا قَدَرُوا اللــه حَقَّ قَدْرِهِ) অর্থাৎ তারা তাঁর যথাযথ বড়ত্ব প্রকাশ করেনি।

মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি, ক্ষমতা ও মহা পরাক্রমশীলতা বুঝা আমাদের কতই না প্রয়োজন!

আমাদের জন্য জরুরী আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বুঝা এবং তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র করা। আমরা যখন এটা বুঝবো, তখন আমাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ও তার আদেশ-নিষেধের ভালবাসা, মহত্ব ও সম্মান সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (ما لكم لا ترجون للــه وقارا).

"তোমাদের কি হল, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে একেবারেই ভয় করো না!?" অর্থাৎ তাঁর সাথে সম্মানের ব্যবহার করো না।

হাসান বসরী রহ: বলেন: অর্থাৎ তোমাদের কি হল, যে তোমরা আল্লাহর তা'আলার হক বুঝ না এবং তার শুকর আদায় কর না!

মুজাহিদ রহ: বলেন: অর্থাৎ তোমাদের রবের বড়তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না।

ইবনে আব্বাস রা: বলেন: তার যথাযথ সম্মান বুঝ না।

ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: এসকল মতগুলো একটি অর্থের দিকেই ফিরে। তা হচ্ছে, তারা যদি আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব প্রকাশ করত এবং তার যথাযথ সম্মান বুঝত, তাহলে অবশ্যই তাকে এক বলে স্বীকার করত, তার আনুগত্য করত এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করত। আর আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য হচ্চে তার অবাধ্যতার কাজসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং তার সম্মান অনুযায়ী তার থেকে লজ্জাবোধ করা।

- সবচেয়ে বড় মূর্খতা: ইবনুল কায়্যিম রহ : বলেন: সবচেয়ে বড় জুলুম ও মূর্খতা হল, তুমি মানুষের নিকট হতে শ্রদ্ধা ও সম্মান কামনা করবে, অথচ তোমার অন্তর আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদা থেকে মুক্ত। কারণ তুমি যখন মাখলুকের সম্মান ও বড়ত্ব প্রকাশ কর, তখন ওই ব্যক্তি তোমাকে এ অবস্থায় দেখছে যে, তুমি আল্লাহকে এতটুকু সম্মান করছো না যে, আল্লাহ তোমাকে এ অবস্থায় দেখুক, তা তুমি চাও।
- আন্তরিকভাবে আল্লাহকে সম্মান করার বিভিন্ন রূপ:

১. আল্লাহ তা'আলার সম্মান থাকার একটি আলামত হল, তাঁর কোন সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ না করা। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও না: যেমন: এরূপ বলা: 'আল্লাহ ও তোমার জীবনের শপথ! আমার আল্লাহ ও তুমি ব্যতীত কেউ নেই'। অথবা ''আল্লাহ ও আমি যা চাই'।

২. ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদা দানের ক্ষেত্রেও না।

৩. আনুগত্যের ক্ষেত্রেও না। যেমন তুমি মাখলুকের আদেশ-নিষেধের এমনভাবে আনুগত্য করলে, যেমন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হয়, অথবা তার চেয়ে বেশি করলে, যেমনটা অধিকাংশ জালিম ও পাপিষ্ঠদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৪. ভয় ও আশার ক্ষেত্রেও না। অর্থাৎ আল্লাহর বিষয়গুলোকে সহজভাবে দেখবে না, তার হককে ছোট করে দেখবে না, সেগুলোর ব্যাপারে একথা বলবে না যে, এগুলো সব ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং এগুলোকে অতিরিক্ত বিষয় বানাবে না বা এগুলোর উপর মাখলুকের হককে প্রাধান্য দিবে না।

৫. এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূল এক দিকে, একপ্রান্তে, আর লোকজন একদিকে এক প্রান্তে, তখন তুমি লোকজনের দিকে থাকলে, আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে থাকলে না।

৬. মাখলুকের সাথে কথা বলার সময় তাদেরকে স্বীয় মন ও বিবেক সপে দেওয়া আর আল্লাহর খেদমত করার সময় শুধু দেহ ও যবান দেওয়া-এমন অবস্থা থেকে বিরত থাকবে।

৭. নিজের উদ্দেশ্যকে আল্লাহর উদ্দেশ্যের উপর প্রাধান্য দিবে না।

৮. আল্লাহর সম্মানের আরেকটি হল, স্বীয় মনের ভেতরের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর অবগত হওয়াকে লজ্জা করবে।

৯. তার সম্মানের আরেকটি হল, নামি দামি মানরুষকে যতটা লজ্জা করবে নির্জনে আল্লাহ তা'আলাকে তার চেয়ে বেশি লজ্জা করবে।

এ সবগুলো হল অন্তরে আল্লাহর সম্মান না থাকা। যে এমন হবে, আল্লাহ তা'লা মানুষের অন্তরে তার সম্মান বা ভয় সৃষ্টি করবেন না। মানুষের অন্তর থেকে তার ভয় ও সম্মান পড়ে যাবে। যদিও তার অনিষ্টের ভয়ে তাকে সম্মান করতে পারে, কিন্তু এটা হচ্ছে ঘৃণার সম্মান। ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সম্মান নয়।

- আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীতে তার বড়ত্বের কথা চিন্তা কর: আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর বর্ণনা অনেক রয়েছে। একজন মুসলিম যখন তা ভাববে, তখন তার অন্তর কেঁপে উঠবে, হৃদয় স্পন্দিত হবে, মন বিনয়াবনত হবে, তার চেহারা মহা মহিম আল্লাহর সামনে ঝুকে যাবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বশ্রোতা ও সবজান্তা আল্লাহর জন্য নুয়ে পড়বে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ভয় বেড়ে যাবে এবং দাসত্বের মেহরাবে তার গর্দার সিজদায় লুটিয়ে পড়বে।

তার যে সমস্ত সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলী আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তার মধ্যে রয়েছে:

- العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال سبحانه وتعالى .

তিনি মহান, প্রতাপশালী, পরাক্রশালী, বড়ত্বের অধিকারী, শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী, বড়, সুউচ্চ, পবিত্র, উন্নত..

- وهو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون

তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরেন না। আর জিন ও মানুষ মৃত্যুবরণ মরে।

- وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

তিনি নিজ বান্দাদের উপর ক্ষমতাশালী। বজ্র ও ফেরেশতাগণ তার ভয়ে তার প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করে।

عزيز ذو انتقام، قيوم لا ينام، وسع كل شيء علماً، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

তিনি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। চির প্রতিষ্ঠিত, কখনো ঘুমান না। সব জিনিসকে ইলমের মাধ্যমে পরিব্যপ্ত করে আছেন। তিনি চোখের গোপন খেয়ানত এবং অন্তরে যা আছে তাও জানেন।

- গুনাহের কিছু কুফল:

ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: গুনাহের একটি কুফল হল, তা অন্তরে মহান আল্লাহর বড়ত্ব কমিয়ে দেয়।

বিশর আল হাফি বলেন: মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে চিন্তা করত, তাহলে কখনো তার অবাধ্যতা করত না।

যার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব হালকা হয়ে যায়, অত:পর সে গুনাহ ও বিরুদ্ধাচরণে উদাসীন হয়ে যায়, সে যেন জেনে রাখে যে, সে নিজেরই ক্ষতি করছে। আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য বান্দা রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্যতা করে না এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা ই পালন করে। যারা সংখ্যায়ও

আমাদের থেকে অধিক এবং আমাদের থেকে বেশি ভয় ও ইবাদতও করে। তারা দিবারাত্রি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, কখনো বিরতি দেয় না।

- নিজেকে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনায় অভ্যস্ত কর: বান্দা যখন নিজের অন্তরকে নামাযের মধ্যে চিন্তা, অনুধাবন, আনুগত্য ও একাগ্রতায় রাখতে অভ্যস্ত করবে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়, ভালবাসা ও আল্লাহর নিকট যা আছে তার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তার কোন অবস্থা ও কোন কাজ তার সৃষ্টিকর্তার ভয়শূণ্য হবে না।

  ফলে শয়তান যখন তাকে কোন বিষয়ে প্ররোচিত করবে, কোন মন্দ বিষয়কে তার সামনে সুন্দর করে তুলবে, তখন সে এই কথা বলে তা থেকে মুক্ত থাকবে: “আমি সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভয় করি”।

- যিকর দুই প্রকার: কাযী ইয়ায রহ: বলেন: আল্লাহর যিকর দুই প্রকার: অন্তরের যিকর, যবানের যিকর। অন্তর অন্তরের যিকর আবার দুই প্রকার:

  তার মধ্যে একটি হচ্ছে: আল্লাহ তা’আলার বড়ত্ব, মহত্ব, ক্ষমতা, রাজত্ব এবং আসমানসমূহে ও যমীনে তার নিদর্শনবলীর ব্যাপারে চিন্তা করা। এটাই হল সর্বোন্নত ও সবচেয়ে বড় যিকর।

  দ্বিতীয়টি হল: তার আদেশ-নিষেধ পালনের সময় অন্তরে তাকে স্মরণ করা: আর স্মরণ করার মাধ্যমে তিনি যা আদেশ করেছেন, তা পালন করা আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং যেসকল বিষয় সন্দেহপূর্ণ তার নিকট থেমে যাওয়া।

  আর শুধু যবানের যিকর: এটা হল দুর্বল যিকর। কিন্তু তথাপি এর মধ্যেও মহা ফযীলত রয়ছে, যা অসংখ্য হাদিসে এসেছে।

  আল্লাহর যিকরের ফল: আল্লাহ তা’আলার যিকর অন্তরে আল্লাহর বড়ত্বের উপলব্ধি সৃষ্টি করে এবং একথার অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত, আসমানসমূহ ও যমীনকে টলে যাওয়া

থেকে রক্ষা করেন এবং এগুলোর সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। আর তখনই যিকরকারী সফলতা ও প্রশান্তি অনুভব করবে, যে সফলতা ও প্রাপ্তির অনুভূতি তার অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে নিবে।

(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللــه ألا بذكر اللــه تطمئن القلوب).

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। শুনে রাখ, আল্লাহর যিকরে অন্তর প্রশান্ত হয়।"

তিনিই আল্লাহ, যিনি মহান। ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: কতগুলো আশ্চর্যজনক বিষয় হল:

তুমি আল্লাহকে জান, কিন্তু তাকে ভালবাসো না।

তুমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আওয়ায শুন, কিন্তু তাতে সাড়া দাও না।

তুমি আল্লাহর সাথে লেন-দেনের লাভ বুঝ, কিন্তু তারপরও অন্যের জন্য কাজ কর।

তুমি আল্লাহর ক্রোধের পরিমাণ জান, কিন্তু তারপরও তাতেই পতিত হও।

তুমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার মধ্যে বিষন্নতার যন্ত্রণা অনুভব কর, তথাপি তুমি তার আনুগত্যের মাধ্যমে তার ঘনিষ্ঠতা অন্বেষণ কর না।

তুমি আল্লাহর কথা ব্যতীত অন্য কিছুতে লিপ্ত হওয়া ও তার আলোচনা করার মাঝে অন্তরের সংকীর্ণতা অনুভব কর, তথাপি তার স্মরণ ও তার সঙ্গে মুনাজাতের মাধ্যমে বক্ষ প্রশস্ত করার প্রতি আগ্রহী হও না।

তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে অন্তর সম্পর্কিত হলে শাস্তি অনুভব কর, কিন্তু তথাপি আল্লাহর দিকে মনোযোগী ও অনুরাগী হওয়ার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচতে চাও না।

এর থেকে আরও আশ্চর্যজনক হল, তুমি জান, তাকে ছাড়া তোমার কোন উপায় নেই এবং তুমিই তার নিকট সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী, তথাপি তুমি তার থেকে বিমুখ আর যা তার থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করবে, তার দিকে ধাবিত।

- সর্বাধিক আশ্চর্যজনক জিনিস: ফুযাইল ইবনে ইয়াযকে বলা হল: সর্বাধিক আশ্চর্যজনক জিনিস কি? তিনি বললেন: তা হল: তুমি আল্লাহকে চিন, কিন্তু তারপরও তার অবাধ্যতা কর।
- প্রকৃত মুমিন: যার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব বিচরণ করে। যার দেহ সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, যার অন্তর অনুগত হয় এবং মন বিনিত হয়। সে তার রুকুতে রবের সাথে নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে: হে আল্লাহ তোমার জন্যই রুকু করলাম, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কর্ণ, চক্ষু, মগজ, অস্তি, চর্বি সব তোমার সামনে নত হয়েছে।

এ কারণেই ইমাম আহমাদ রহ: বলেন: তুমি যদি তোমার অন্তর পরিশুদ্ধ করে নিতে পার, তখন তুমি আর কাউকে ভয় করবে না।

ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম জনৈক তাগুত বাদশার সামনে দন্ডায়মান। তার সাথে কঠিনভাবে কথা বলছেন। তারপর তিনি প্রত্যাগমন করলেন, তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল: হে ইমাম! আপনি তাকে ভয় করলেন না? তিনি বললেন: আমি আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করছিলাম, একারণে সে আমার নিকট বিড়ালের ন্যায় হয়ে গেল।

কিন্তু এখন দেখি, অনেক মানুষ অফিসার, আইন, প্রশাসন ইত্যাদিকে আল্লাহর থেকে অধিক ভয় করে। কোন সন্দেহ নেই, এটা তার অন্তরের সমস্যা। আর জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় মনের সাথে জেরা করে।

- মুসলিমের জীবনে আল্লাহর বড়ত্ব অনুধাবনের গুরুত্ব: যে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি দিবে, সে তার সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান করবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করবে, তার আদেশ-নিষেধকে বড় মনে করবে এবং তার জন্য তার

একটি ছোট অবাধ্যতাও কঠিন মনে হবে। সে এমন ভয় করবে, যেন একটি আস্ত পাহাড় তার উপর পতিত হবে।

আমরা যদি আল্লাহর বড়ত্ব অনুধাবন করি, তার প্রতি যে দাসত্ব, আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করা আবশ্যক তা উপলব্ধি করি এবং তার যথাযথ হক বুঝতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা নিজেদের মন থেকে বেশি বেশি হিসাব নিতে পারবো, আমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতরাজী ও আমাদের পক্ষ থেকে তার অবাধ্যতার পরিমাণ মিলিয়ে দেখতে পারবো এবং আমাদের প্রতি তার হক ও আমরা আমাদের আখেরাতের জন্য কি অগ্রে প্রেরণ করেছি, তাও মিলিয়ে দেখতে পারবো।

- বড়ত্ব আল্লাহর একটি গুণ: ইমাম ইসবাহানী বলেন: বড়ত্ব আল্লাহর একটি গুণ, কোন সৃষ্টি এর উপযুক্ত নয়।

তবে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাঝেও এক প্রকার বড়ত্ব সৃষ্টি করেছেন, এ কারণে সৃষ্টির কেউ কেউ অন্যকে বড় মনে করে থাকে।

যেমন মানুষের মধ্যে কেউ সম্পদকে বড় মনে করে।

কেউ সম্মানকে বড় মনে করে।

কেউ ইলমকে বড় মনে করে।

কেউ ক্ষমতাকে বড় মনে করে।

কেউ পদকে বড় মনে করে।

এভাবে প্রতিটি সৃষ্টিকেই এক অর্থে সম্মান করা হয়। আরেক অর্থে করা হয় না।

আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববস্থায়ই বড় বা সম্মানিত। সুতরাং যে আল্লাহর বড়ত্বের হক বুঝতে পেরেছে, তার উচিত, এমন কথা না বলা, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন, এমন কোন গুনাহয় লিপ্ত না হওয়া, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন না। কারণ প্রতিটি মানুষ যা অর্জন করেছে, তিনি তার হিসাব গ্রহণ করবেন।

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত।”

ইমাম ইবনে কাসীর রহ: বলেন: অর্থাৎ আদম সন্তান যত কথা বলে, তার প্রতিটি কথা পর্যক্ষেণকারী সদা উপস্থিত ফেরেশতা রয়েছে, যে প্রতিটি কথা লিখে রাখে, একটি শব্দ বা একটি হরকতও ছাড়ে না। অনুরূপ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে প্রহরীগণ নিযুক্ত আছে। সম্মানিত লেখকগণ। যারা জানে, তোমরা যা কর।”

- অন্তর ঠিক হয় যবান ঠিক হওয়ার দ্বারা: রাসূল সা: বলেন: বান্দার ঈমান ঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর ঠিক না হয় আর বান্দার অন্তর ঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার যবান ঠিক না হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ)
- যবানকে উপকারী কথায় ব্যস্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা: যবানকে আল্লাহর যিকরে ব্যস্ত রাখ, তার আনুগত্য, তাসবীহ, হামদ, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) ও ইস্তেগফারে ব্যস্ত রাখ। রাসূলুল্লাহ সা: এক মজলিসে ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করতেন। আমরা কি আমাদের কোন মজলিসে একবারও আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি?
- তুমি কত পুরস্কার ও কল্যাণ নষ্ট করে দিলে: হে আল্লাহর বান্দা! তুমি একটি মজলিসে বসে কথাবার্তা বলছো, কিন্তু তুমি জান না, তুমি কি হারাচ্ছো। তুমি যদি

যিকর ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করতে তাহলে সেটা তোমার জন্য কতই না ভাল হত। এতে তোমার হয়ত দুই মিনিট বা তিন মিনিট সময় ব্যয় হত। তুমি যদি এই দুনিয়ায় একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করতে চাইতে, তাহলে তাতে তুমি কত চেষ্টা ও সময় ব্যয় করতে! পানি দিতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে, পরিচর্যা করতে। এতে ফল দিতে হয়ত এক বছর লেগে যেত। আবার কখনো ফল না দেওয়ার সম্ভাবনাও থাকত। কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যে তুমি জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ লাভ করতে পারতে, যার কান্ড হত স্বর্ণের। তুমি কি কখনো কোন মজলিসে একশত বার সুহবানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি বলে দেখেছো? তোমার পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগত না।

হে ভাই! তুমি যবানের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া থেকে সাবধান হও। কারণ এটি হল একটি হিংস্র ক্ষতিকর জন্তুর ন্যায়, তুমি যার প্রথম শিকার।

হে ভাই! যবানের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া থেকে সাবধান হও। কারণ তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে এটাই তোমার বিরুদ্ধে সর্বাধিক অপরাধ করে থাক। তুমি তোমার আমলনামায় কিয়মাতের দিন যত বদ আমল দেখতে পাবে, তার অধিকাংশই তোমার যবানই তোমার বিরুদ্ধে লিখিয়েছে। নবী সা: বলেছেন: মানুষের মুখের ফসলগুলোই মানুষকে জাহান্নামে উল্টোমুখী করে বা নাকের উপর করে নিক্ষেপ করে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী রহ:)

একারণেই নবী সা: বলেছেন: যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন হয়ত ভাল কথা বলে, নয়ত চুপ থাকে। (বুখারী মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা: বলেন: দীর্ঘ সময় বন্দী করে রাখার ক্ষেত্রে তোমার যবান থেকে উপযুক্ত জিনিস আর কিছু নেই।

- ভদ্রতা কি?

  আহনাফ ইবনে কায়সকে ভদ্রতা ও মানবতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন: সত্যকথন, মুসলিম ভাইদের সাথে সদাচরণ ও সর্বস্থানে আল্লাহর স্মরণ।

- প্রাজ্ঞবানী: অনেক কথা মুখ দিয়ে চলে আসে, আর তার কারণে মানুষ ধ্বংস হয়।
- প্রকৃত মুসলিম: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: মুসলিম সে ই, যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।
- সবচেয়ে কঠিন আমল: দাউদ আত-তায়ী একদা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আযীযকে বলেন: তুমি কি জান না, যবানের হেফাজত করাই সবচেয়ে কঠিন ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল? তিনি বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কি অবস্থা হবে?
- যবানের ব্যাপারে সালাফদের অবস্থা: হাসান বসরী রহ: বলেন: যবান হল, দেহের নিয়ন্ত্রক। যখন তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কোন অপরাধ করে, তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধে লিপ্ত হয়। যবান যখন ভাল থাকে, তখন সমস্ত দেহও ভাল থাকে। হাসান ইবনে সালিহ বলেন: আমি তাকওয়ার অনুসন্ধান করলাম। তাতে যবানের চেয়ে কম আর কিছুর মধ্যে পেলাম না।

  ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: থেকে বর্ণিত, তিনি আবু বকর রা: এর নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, আবু বকর রা: তার জিহ্বা টেনে ধরেছেন। ওমর রা: বললেন: থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আবু বকর রা: বললেন: এটা আমাকে অনেক ঘাটে অবতরণ করিয়েছে! কে বললেন একথা?! তিনি হলেন নবী রাসূলদের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু।

  তাউস ইবনে কাইসান দীর্ঘ নিরবতার ব্যাপারে ওযর পেশ করতেন। তিনি বলতেন: আমি আমার যবানকে পরীক্ষা করেছি, আমি দেখলাম সে হচ্ছে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় দুষ্ট।

- কিভাবে তুমি তোমার দোষ-ক্রুটি গোপন করবে? কায়েস ইবনে সায়িদা ও আকসাম ইবনে সাইফী একজায়গায় একত্রিত হলেন। একজন আরেকজনকে বললেন: আদম সন্তানের মধ্যে কি পরিমাণ দোষ পেলে? অপরজন বলল: তা অগণিত, আমি

৮ হাজার গুনেছি। তারপর একটি পদ্ধতি পেয়েছি, যেটি অবলম্বন করলে তুমি তোমর সব দোষ গোপন করতে পারবে। প্রথমজন বললেন: তা কি? অপরজন বললেন: তা হেে ছ যবানের হেফাজত করা।

- যবানের হেফাজত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য: জনৈক তাবিয়ী বলেন: আমি আতা ইবনে আবি রাবাহের সাথে ত্রিশ বছর হেরেমে থেকেছি। এ সময় তিনি কখনো আল্লাহ ও তার আয়াতসমূহের আলোচনা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎকাজে বাঁধা প্রদান ও অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলেননি। আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: তোমরা কেন বুঝ না! তোমরা কি ভুলে গেছ, তোমাদের উপর ফেরেশতা নিযুক্ত আছে, যারা তোমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসও সংরক্ষণ করেন এবং প্রতিটি কথাবার্তা লিখে রাখেন। এর দ্বারা আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন করবে।
- যে সমস্ত বিষয় থেকে যবানকে হেফাজত করা হবে: অভিশম্পাত দেওয়া, অশ্লীল ও লাগামহীন কথাবার্তা বলা, বেশি বেশি আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক হাসি-ঠাট্টা করা, আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক অনর্থক কথাবার্তা অধিক পরিমাণে বলা এবং গীবত, চোগলখোরী ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা থেকে যবানকে হেফাজত করতে হবে। বিশেষত: আল্লাহর আয়াত, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূল, উলামা, তালিবুল ইলম, দায়ি ও মুজাহিদদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করা থেকে হেফাজত করতে হবে। কারণ এগুলো নেফাকির আলামত।
- কিভাবে যবানকে হেফাজত করা যাবে?

১. যবানকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করা: এবং যবানকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করলে আল্লাহর নিকট কি পরিমাণ বিনিময় রয়েছে, তা অনুধাবন করা। কারণ উত্তম কথা তোমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। কারণ বিশুদ্ধ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন: বান্দা এক টুকরো খেজুর ও একটি উত্তম কথার দ্বারা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়।
২. সালাফে সালিহের জীবনী পাঠ: তাতে উত্তম নমুনা রয়েছে, যা অর্থবহ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

৩. আল্লাহর নিকট দু'আ করবে, যেন আল্লাহ তোমার যাবানকে অনর্থক কথা থেকে হেফাজত করেন এবং সঠিক কথা বলার তাওফীক দান করেন। কারণ এর দ্বারা আমল সংশোধন হবে এবং গুনাহ মাফ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يأيها الذين ءامنوا اتقوا اللــه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعما لكم ويغفر لكم ذنوبكم"

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমল সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।”

হাদিসে বর্ণিত দু'আর মধ্যে রয়েছে: (اللــهم اهدني وسددني) “হে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান কর এবং আমার কথা ও কাজ সঠিক করে দাও।”

এই বলে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন যবান চাই, যা তোমাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে এবং এমন যবান থেকে আশ্রয় চাই, যা তোমাকে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত করবে।

- কথার মধ্যে দু'টি বড় বিপদ রয়েছে: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: যবানের মধ্যে দু'টি বড় বিপদ রয়েছে, যার একটি থেকে মুক্তি পেলেই আরেকটি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। একটি হল: কথা বলার বিপদ, আরেকটি হল: চুপ থাকার বিপদ। আপন আপন সময়ে প্রত্যেকটিই অপরটি থেকে বড় বিপদ হতে পারে।

যেমন যে হক কথা বলা থেকে চুপ থাকে, সে হল বোবা শয়তান, আল্লাহর অবাধ্য, মানুষকে প্রদর্শনকারী, শৈথিল্যকারী, (যদি নিজের উপর আশংকা না থাকে)। আর যে ভ্রান্ত কথা বলে সে হল, বাকশীল শয়তান, আল্লাহর অবাধ্য। বেশিরভাগ মানুষই কথা বলা ও চুপ থাকার ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত। মধ্যমপন্থীরাই হচ্ছে সরল সঠিক পথের অনুসারী। যারা নিজেদের যবানকে বাতিল কথা থেকে হেফাজত করে আর যা পরকালে উপকারী হবে, তা বলে।

যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى)

"বল, দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার তুচ্ছ। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আখেরাতই উত্তম।"

ইমাম বাগাবী রহ: বলেন: অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি বল, তার উপকারীতা ও তার দ্বারা সুবিধা গ্রহণ তুচ্ছ ও নগন্য। যারা শিরক ও রাসূলের অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে তাদের জন্য আখিরাতই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

- যুহ্দ এর সংজ্ঞা: যুহদ হল, দুনিয়ার প্রতি পতনশীলতার দৃষ্টি দেওয়া, ফলে তা তুচ্ছ মনে হওয়া এবং তা থেকে বিমুখ থাকা সহজ হওয়া।

  ইমাম আহমাদ রহ: বলেন: যুহদ হল স্বল্প আশা করা।

  তার থেকে এরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, যুহদ হল: দুনিয়া আসার কারণে আনন্দিত না হওয়া এবং চলে যাওয়ার কারণেও দু:খিত না হওয়া। তাকে জিজ্ঞেস করা হল: এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিনার আছে, সে কি যাহেদ (দুনিয়া বিমুখ)? তিনি বললেন: হ্যাঁ, হতে পারে, শর্ত হল, তা বৃদ্ধি পেলেও সে আনন্দিত হতে হবে না এবং কমে গেলেও দু:খিত হবে না।

  আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যুহ্দ (দুনিয়াবিমুখীতা) অবলম্বন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তার প্রশংসা করেছেন এবং তার বিপরীত অবস্থাকে মন্দ বলেছেন। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি আর আখেরাত থেকে বিমুখ হওয়াকে নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى "আসলে তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাতই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।"

রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: দুনিয়া যদি আল্লাহর নিকট মাছির পাখা সমপরিমাণও হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কোন কাফেরকে দুনিয়ার এক ফোটা পানিও পান করাতেন না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

- গভীর প্রজ্ঞাবনী: ইমাম আহমাদ রহ: বলেন: দুনিয়ার কমটা যথেষ্ট হয়, কিন্তু বেশিটা যথেষ্ট হয় না।
- যুহদের হাকীকত: যুহদ শুধু দরীদ্রতা নয় বা এমনটাও নয় যে, তোমার থেকে দুনিয়া ফিরিয়ে রাখা হল, ফলে তুমি ফিরে থাকলে; বরং যুহ্দ হল: তোমার অন্তরে মাল থাকবে না, যদিও তোমার হাতে মাল থাকে।
- তুমি কিভাবে দুনিয়া বিমুখ হবে? তার কয়েকটি পন্থা:

১. বান্দা নিজের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর নিকট যা আছে তার উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া। আর এমন অবস্থা তৈরী হবে আখেরাতের প্রতি সত্যিকার ও নিশ্চিত বিশ্বাসের দ্বারা। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের রিযিকের যিম্মাদারী নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وما من دابة في الأرض إلا على اللـــه رزقها "যমীনে যত প্রাণী আছে, সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর।"

২. বান্দার অবস্থা এমন হওয়া যে, যখন তার কোন বিপদ আসে, যেমন সম্পদ, সন্তান বা অন্য কিছু চলে যায়, তখন সে দুনিয়ায় যা কিছু চলে গেছে, তার থেকে আখেরাতে যে বিনিময় স্থায়ীভাবে লাভ করবে, তার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে। আর এটাও পরিপূর্ণ ইয়াকীনের দ্বারাই সৃষ্টি হয়।

৩. বান্দার নিকট হকের ব্যাপারে তার প্রশংসাকারী আর নিন্দাকারী সমান হয়ে যাওয়া: এটা দুনিয়া বিমুখতা, তাকে তুচ্ছ মনে করা ও তার প্রতি কম আগ্রহ থাকার একটি প্রমাণ। কারণ যার নিকট দুনিয়া বড় হবে, সে প্রশংসাকে ভালবাসবে এবং নিন্দাকে অপছন্দ করবে। ফলে এটা তাকে নিন্দার ভয়ে অনেক হক বর্জন করতে এবং প্রশংসার আশায় অনেক অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে উদ্ধুদ্ধ করবে।

সুতরাং যার নিকট তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী সমান হয়ে যাবে, এটাই তার অন্তর থেকে মাখলুকের বড়ত্ব দূর হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ ও যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে তার ভালবাসা দৃঢ় হওয়ার প্রমাণ বহন করবে।

- দুনিয়ার স্বাদ ও আখেরাতের স্বাদের মাঝে পার্থক্য: ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: আখেরাতের স্বাদ বড় ও স্থায়ী আর দুনিয়ার স্বাদ ছোট ও সাময়িক। এমনিভাবে দুনিয়ার কষ্ট ও আখেরাতের কষ্টও এমনই। আর এর ভিত্তি হল ঈমান ও ইয়াকীনের উপর। তাই যখন ঈমান শক্তিশালী হয়ে যাবে, অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে ফেলবে, তখন সে উন্নত স্বাদকে নি¤œটার উপর প্রাধ্যান্য দিবে এবং কঠিন যন্ত্রণার পরিবর্তে লঘু যন্ত্রণা সহ্য করে নিবে।

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

“তারা বলল, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তার কসম! আমাদের নিকট যে উজ্জল নিদর্শনাবলী এসেছে, তার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারবো না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর, তুমি যাই কর না কেন তা এই পার্থিব জীবনেই হবে।”

- যুহদই স্বস্তি: জনৈক দুনিয়াবিমূখ সালাফ বলতেন: দুনিয়া বিমুখতা মন ও দেহের স্বস্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ, চিন্তা ও পেরেশানী।
- দু’টি একত্রিত হয় না: বলা হয়ে থাকে: আল্লাহ তা’আলা দাউদ আ: এর নিকট ওহী পাঠালেন যে, আমি অন্তরসমূহের উপর হারাম করেছি যে, একই অন্তরে আমার ভালবাসা আবার অন্যদের ভালবাসা একত্রিত হতে পারবে না। হে দাউদ! তুমি যদি আমাকে ভালবাসা, তাহলে অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা দূর করে ফেল। কারণ আমার ভালবাসা আর দুনিয়ার ভালবাসা এক সাথে জমা হয় না। হে দাউদ! যারা আমাকে ভালবাসে, তারা সেই সময় আমার সামনে দাড়িয়ে তাহাজ্জুদ পড়ে, যখন অলস লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং তারা নির্জনে আমাকে স্মরণ করে, যখন গাফেলরা বিভোর থাকে।

- দুনিয়ার বিবরণ: আলী রা: কে বলা হল: আমাদের জন্য দুনিয়ার বর্ণনা তুলে ধরুন। তিনি বললেন: সংক্ষেপে না দীর্ঘ করবো? তারা বলল: সংক্ষেপে। তিনি বললেন: দুনিয়ার হালালগুলোর হিসাব দিতে হবে আর হারামগুলোর জন্য আযাব হবে।
- যুহদের সুফল:

  ১. আল্লাহর সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ।

  ২. দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া এবং তার জন্য অনুতাপ না থাকা।

  ৩. নেতৃত্ব ও পদের লোভ থেকে মুসলিমদের সুরক্ষা

  ৪. মানুষকে দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের ফেৎনা থেকে মুসলিমদের সুরক্ষা, যা আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে মন ফিরিয়ে রাখে।

  ৫. নারীদের ফেৎনা থেকে সুরক্ষা।

  ৬. হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা এবং এমন সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকতে সহায়ক, যা হারামে পৌঁছে দেয়।

  ৭. ফুযায়ল ইবনে ইয়ায বলেন: তোমাদের অন্তরসমূহের জন্য এটা অসম্ভব যে, দুনিয়া বিমুখ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ পাবে।
- কিভাবে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে? ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন: দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। তাই দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় ঈমানের সমস্যার কারণে, অথবা জ্ঞানের সমস্যার কারণে, অথবা উভয়ের যৌথ সমস্যার কারণে। একারণেই রাসূলুল্লাহ সা: ও তার সাহাবীগণ দুনিয়াকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছেন। তারা তার থেকে তাদের অন্তর ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে এমনভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন, যে তার প্রতি আর ঝুকেননি। দুনিয়াকে জেলখালা মনে করেছেন; জান্নাত নয়। তাই তারা দুনিয়ার ব্যাপারে প্রকৃত যুহদ অবলম্বন করেছিলেন। তারা চাইলে দুনিয়ার সকল প্রিয় বস্তুই লাভ করতে পারতেন, প্রতিটি আগ্রহই পুরা করতে পারতেন, কিন্তু তারা বিশ্বাস করতেন: এটা হল কোন রকমে অতিক্রম করার জায়গা; আনন্দের জায়গা নয়। এটা হল, গ্রীস্মের মেঘের ন্যায়, যা

সামান্যতেই বৃষ্টিপাত করে। এক উদ্ভট স্বপ্নের ন্যায়, যা এখনো দেখা শেষ হয়নি; অমনি সফরের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হল।

- যুহদ অবলম্বনে সহায়ক বিষয়সমূহ:
    - দুনিয়ার দ্রুত পতন, তার ধ্বংসশীলতা, অসম্পূর্ণতা ও হীনতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং তাতে ভীড় জমানোর মধ্যে যে দু:খ, কষ্ট ও দুর্ভোগ রয়েছে তা চিন্তা করা।
    - আখেরাতের আগমন, তার স্থায়িত্ব ও তাতে যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করা।
    - মৃত্যু ও পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।
    - আখেরাতের জন্য মুক্ত হওয়া, আল্লাহর ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া এবং সময়গুলোকে যিকর ও কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা আবাদ করা।
    - দ্বীনি স্বার্থকে দুনিয়াবী স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া।
    - খরচ করা, দান করা এবং অধিক পরিমাণে সদকা করা।
    - দুনিয়াদারদের মজলিস ত্যাগ করা এবং আখেরাতকামীদের মজলিসের অন্তর্ভূক্ত হওয়া।
    - যাহেদদের ঘটনাবলী পাঠ করা, বিশেষত: রাসূলুল্লাহ সা: ও সাহাবীদের জীবনী।
    - দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন কোন নফল কাজ নয়, বরং এটা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা নবী সা: ও তার সাহাবীগণ অবলম্বন করেছিলেন। এটাই আল্লাহর ভালাবাসা এবং মানুষের ভালাবাসা লাভের একমাত্র পথ। হাদিসের মধ্যে এসেছে: জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমি করলে আল্লাহও আমাকে ভালবাসবে এবং মানুষও ভালবাসবে। তিনি বললেন: দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বন কর; তাহলে তোমাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে, সেগুলোর ব্যাপারে বিমুখতা

অবলম্বন কর; তাহলে তোমাকে মানুষ ভালবাসবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ)

- আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللـــه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)

“সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে। অত:পর প্রত্যেককে সে যা উপার্জন করেছে, তা বুঝিয়ে দেওয়া হবে, তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হবে না।”

রাসূল সা: বলেন: যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালাবাসে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তাকে অপছন্দ করেন। আয়েশা রা: বা রাসূলের কোন একজন স্ত্রী বললেন: আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন এটা নয়। বরং বিষয়টা হল: যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার পক্ষ থেকে সম্মান লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার নিকট তার সামনে যা আছে, তার থেকে অধিক প্রিয় কিছু থাকে না। তাই সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালবাসে, ফলে আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে ভালবাসেন। আর কাফেরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আযাব ও শাস্তির সংবাদ শোনানো হয়। তখন তার নিকট তার সামনে যা আছে, তার থেকে অপছন্দনীয় আর কিছু থাকে না। ফলে সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, ফলে আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী)

আবুদ দারদা রা: বলেন: আমি আমার প্রভুর সাক্ষাতের আশায় মৃত্যুকে ভালবাসি।

আবু আম্বাসা আলখাওলানী বলেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা এই ছিল যে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাদের নিকট মধুর চেয়েও প্রিয় ছিল।

ঘনিষ্ঠ ও অপরিচিত: অনুগত বান্দা স্বীয় রবের ঘনিষ্ঠ। সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকে ভালবাসে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎকে ভালবাসেন।

আর গুনাহগারের মাঝে ও তার মনিবের সাথে থাকে দূরত্ব। গুনাহের দূরত্ব। সে তার প্রভুর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে। আর তার তো এমনটা হবেই। যুননুন রহ: বলেন: প্রত্যেক অনুগতই ঘনিষ্ট আর প্রত্যেক গুনাহগারই অপরিচিত।

- আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি কিভাবে হবে?

১. আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসা। কারণ এমনটা তো কল্পনা করা যায় না যে, অন্তর কোন প্রিয়জনকে ভালবাসবে, আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তার দর্শনকে ভালবাসবে না।
২. বিভিন্ন প্রকার কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা। ধৈর্য হল ভালবাসার পথের গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রেমিকদের জন্য এটা জরুরী।
৩. আল্লাহর সঙ্গে নির্জনতা ও মুনাজাত এবং তার কিতাবের তিলাওয়াত হবে তার প্রিয় জিনিস। তাই সর্বদা তাহাজ্জুদ পড়বে। রাতের নিরবতা ও সকল প্রকার বাঁধামুক্ত অবসর সময়গুলোকে গনিমত মনে করবে| কারণ আনন্দ লাভের সর্বনি¤œ স্তরটাই হল প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করা। তাই যার নিকট ঘুম ও কথাবার্তায় লিপ্ত থাকা রাতের মুনাজাতের চেয়ে অধিক মজাদার হবে, তার ভালবাসা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? কারণ প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের খেদমত ও আনুগত্যে থাকাতেই অধিক স্বাদ অনুভব করে। আর যখন ভালবাসা শক্তিশালী হবে, তখন তার আনুগত্য ও খেদমতও শক্তিশালী হবে।
৪. তার উপর অন্য কোন প্রেমাস্পদকে প্রাধান্য না দেওয়া: আল্লাহ ও তার রাসূলই তার নিকট অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া। বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সা: এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি ওমর রা: এর হাত ধরা। ওমর রা: বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ব্যতীত আর সব কিছু থেকে অধিক প্রিয়। রাসূল সা: বললেন: না চলবে না, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের

চেয়েও প্রিয় না হব। এবার ওমর রা: বললেন: এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়। নবী সা: বললেন: এবার ঠিক আছে ওমর!

তাহলে আল্লাহকে ভালবাসার একটি আলামত হল: বান্দা কৃর্তক আল্লাহর উপর কোন জিনিসকে প্রাধান্য না দেওয়া। না নিজের সন্তান বা পিতামাতাকে, না অন্য কোন মানুষকে এবং না নিজ প্রবৃত্তিকে। যে আল্লাহর উপর তার অন্য কোন প্রিয় জিনিসকে প্রাধান্য দিল, তার অন্তর রোগী।

৫. সর্বদা আল্লাহর যিকরে লিপ্ত থাকা। তার যবান তা থেকে বিরতি না দেওয়া এবং তার অন্তর কখনো তা থেকে মুক্ত না হওয়া। কারণ যে কোন জিনিসকে ভালবাসে, অনিবার্যভাবেই সে তার ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের আলোচনা বেশি বেশি করবে। ফলে তার ইবাদত, তার কালাম, তার স্মরণ, তার আনুগত্য ও তার ওলীদেরকে সে ভালবাসবে।

৬. আল্লাহর কালামকে ভালবাসা। তাই যখন তুমি তোমার নিজের মাঝে বা অন্য কারো মাঝে আল্লাহর ভালবাসা আছে কি না তা পরিক্ষা করতে চাইবে, তখন দেখবে, তার অন্তরে কুরআনের ভালবাসা আছে কিনা। কারণ এটা সকলে জানা কথা যে, যে কোন প্রিয়জনকে ভালবাসে, তার নিকট তার কথাই সর্বাধিক প্রিয় হয়।

৭. আল্লাহর যে সকল ইবাদত ও যিকর তার থেকে ছুটে গেছে, তার জন্য আফসোস করা: তাই দেখবে, তার নিকট সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হবে, কোন একটি সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই যখন তার থেকে কোন একটি সময় চলে যায়, তখন সে তার জন্য এত ব্যথিত হয়, যা সম্পদের লোভী ব্যক্তির স্বীয় সম্পদ হাতছাড়া হওয়া, চুরি হওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাথা থেকে অধিক। সে দ্রুত এর কাযা করে নেয়, সুযোগ হওয়ার সাথে সাথেই।

- তারা নিফাকের আশংকা করতেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا)

“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি তাদের পক্ষে কোন সাহায্যকারী পাবে না।”

আল্লামা সা'দী বলেন: এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের পরিণতি বর্ণনা করছেন: তারা সর্বনিকৃষ্ট আযাব ও শাস্তিতে থাকবে। তারা থাকবে সমস্ত কাফেরদের নি¤œস্তরে। কারণ তারা আল্লাহর সাথে কুফরী ও রাসূলের দুশমনীর ক্ষেত্রে তো তাদের মত, আর তার উপর অতিরিক্ত, তারা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত করেছে এবং মুনিদের বিরুদ্ধে এমনভাবে বিভিন্ন প্রকার শত্রুতা করার সুযোগ পেয়েছে, যা অনুভব ও উপলব্ধিও করা যায় না। আর এই কপটচারিতার দ্বারা তারা নিজেদের উপর ইসলামের বিধান কার্যকর করাতে সমর্থ হয়েছে এবং এমন বিষয়ালীর অধিকারী হয়েছে, যার অধিকারী তারা ছিল না।

একারণে এবং এধরণের অন্যান্য কারণে তার সবচেয়ে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাদের আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির কোন পথ নেই এবং তাদের এমন কোন সাহায্যকারীও নেই, যে তাদের থেকে তার আযাবকে প্রতিহত করবে। একথা সকল মুনাফিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে যাদেরকে আল্লাহ মন্দ কর্ম থেকে তাওবা করার তাওফীক দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন তারা ব্যতীত।

বুখারী ও মুসলিম রহ: থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সে হবে কাট্টা মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোনওটি থাকবে, তার মধ্যে নিফাকির একটি বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধর্তব্য হবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। উক্ত বৈশিষ্টগুলো হল: সে যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে তার ব্যতিক্রম করবে, প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং ঝগড়া করলে পাপাচার করবে।

- নিফাকের কয়েকটি আলামত:
  - মিথা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদার বরখেলাফ করা, মিথ্যা কসম কাটা এবং প্রতিশ্রুতি দিলে গাদ্দারি করা।
  - আরেকটি হল: ইসলামের মূল ও প্রধান বিষয়, তথা কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করা এবং নেককার ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাট্টা করা।

- নামাযে অলসতা করা। মসজিদের প্রতিবেশি হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে না যাওয়া। আর সেখানে নামায পড়ার চেয়ে বড় মুনাফিকি আর কি আছে?!
- মানুষকে নিজের আমল দেখানো এবং খ্যাতি কামনা করা।
- আল্লাহর যিকর কম করা।
- আল্লাহর ক্রোধের বিষয়সমূহকে পছন্দ করা।

• আরবি ব্যতীত অন্য ভাষা শিখে গর্ববোধ করা: শায়খুল ইসলাম বলেন: যে আরবি ব্যতীত অন্য কোন ভাষা শিখে, তাতে কোন লাভ নেই। গর্ব করা, না করার ভিত্তি হল আরবি ভাষা। তাই এটা নেফাকির আলামত। এটা ঈমানের ক্রুটি ও ঈমানকে কম মূল্যায়ন করার ফলে সৃষ্টি হয়।

• জিহাদ পরিত্যাগ করা নিফাকির আলামত: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: যে জিহাদ না করে বা জিহাদের সংকল্পও না করে মৃত্যুবরণ করল, সে নিফাকির একটি শাখাসহ মৃত্যুবরণ করল। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

ইমাম নববী রহ: বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: যারা এমনটা করে, তারা এই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে জিহাদ হতে পশ্চাতে অবস্থানকারী মুনাফিকদের মত। কারণ জিহাদ পরিত্যাগ করা নেফাকির একটি অংশ।

• আরেকটি নেফাক হল: নামাযকে সঠিক সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া: যারা নামাযকে সঠিক সময় থেকে বিলম্ব করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) "তাই দুর্ভোগ ওই সমস্ত নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে অলসতা করে।"

অর্থাৎ সঠিক সময় থেকে বিলম্ব করে এবং একেবারে সময়ের পরে আদায় করে। যেমনটা ইমাম মাসরুক রহ: বলেছেন। এটা মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। একদল লোক আসরের নামায বিলম্ব করে পড়েছিল, দেখুন রাসূল সা: তাদের ব্যাপারে কি বলেছেন- "এটা মুনাফিকের নামায। এটা মুনাফিকের নামায"। সে অপেক্ষায়

থাকে, সূর্য শয়তানের দুই সিংয়ের মধ্যখানে আসার, তারপর দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর দেয়, যাতে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

- যারা আল্লাহর জন্য আমল করে, তাদেরকে তিরস্কার করা: ইবনে কাসীর রহ: বলেন: আল্লাহর জন্য আমলকারীদেরকে তিরস্কার করা মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। তাদের ছিদ্রান্বেষণ ও তিরস্কার থেকে কখনোই কেউ নিরাপদ থাকে না।
- নেককাজে ওযর পেশ করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের উপকারী কাজে প্রতিযোগীতা না করাও মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর শপথ! আমরা নিজেদের ব্যাপারে এবং আমাদের ভাইদের ব্যাপারে এই ভয়ংকর কুস্বভাবের আশংকা করি, যার ব্যাপারে মুসলিমগণ উপলব্ধিই রাখে না।

আপনারা এই আয়াতটির ব্যাপারে চিন্তা করুন, যেটা বনী সালামা গোত্রের জাদ ইবনে কায়সের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। একদা রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: হে জাদ! তুমি কি এ বছর রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে? সে ওযর পেশ করল, যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

"আর তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যে বলে আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেৎনায় ফেলবেন না। জেনে রাখ, ফেৎনায় তারা পড়েই আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রাখবে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ)

"তোমার কাছে জিহাদ না করার অনুমতি চায় তো তারা, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহে নিপতিত। ফলে তারা নিজেদের সন্দেহের ভিতর দোদুল্যমান।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা তার নবী সা: কে মুনাফিকদের আলামত জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে নিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যাবে, তা হচ্ছে, তাদেরকে যখন জিহাদে বের হতে বলা হবে, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট জিহাদে বের না হওয়ার অনুমতি প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ সা: কে বলছেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি যখন তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হও, তখন যদি কেউ ওযর ব্যতীত জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকতে তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে তুমি অনুমতি দিবে না। কারণ এ ব্যাপারে তোমার নিকট অনুমতি চায় শুধু মুনাফিকরাই, যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।

- আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার বর্জন করা নেফাকির আলামত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللـــه فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, সকলেই একে অন্যের মত। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং তারা ভাল কাজে বাঁধা দেয় এবং নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ।"

- মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করা: তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল: তারা মুসলমানদেরকে নির্বোধ, স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ও কম চিন্তাশীল বলে। আর তারা নিজেদেরকে মনে করে সঠিক চিন্তার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)

“যখন তাদেরকে বলা হয়, লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে, তোমরা সেরূপ ঈমান আন, তখন তারা বলে: নির্বোধরা যেরূপ ঈমান এনেছে, আমরা কি সেরুপ ঈমান আনবো!?”

- তারা নিফাকির আশংকা করতেন: হাফেজ ইবনে রজব রহ: বলেন: সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সালাফে সালিহগণ নিজেদের ব্যাপারে মুনাফিকির আশংকা করতেন। একারণে তারা প্রচন্ড চিন্তা ও পেরেশানী অনুভব করতেন। একারণে একজন মুমিন ব্যক্তি নিজের উপর ছোট নিফাকির আশংকা করবে এবং এই আশংকা করবে যে, পাছে তা পরিণামে তার উপর প্রবল হয়ে যায়, অত:পর বড় নিফাকির রূপ পরিগ্রহ করে। যেমনটা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে: সুপ্ত মন্দের ছিটেফোটাই পরিণতিতে মন্দ পরিসমাপ্তির কারণ হয়।

  ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: হুযায়ফা রা:কে বলেন: হে হুযায়ফা! আমি তোমাকে আল্লাহর দুহাই দিয়ে বলছি, বল, রাসূলুল্লাহ সা: কি তোমার নিকট তাদের মধ্যে আমার নামও উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন: না, তবে এর পর আর কাউকে আমি এমনটা বলবো না।

  হাসান বসরী রহ: বলেন: আমি যদি জানতে পারি, আমি নিফাক থেকে মুক্ত, তাহলে এটাই আমার নিকট পুরো পৃথিবী থেকে উত্তম হবে।

  ইবনে আবি মুলাইকা বলেন: আমি রাসূলুল্লাহর ত্রিশ জন সাহাবীকে পেয়েছি, প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে মুনাফিকির আশংকা করতেন।

  হাসান বসরী রহ: বলেন: নিফাক হল: ভেতর-বাহির বা কথা-কাজে মিল না থাকা।

- নিফাক থেকে সবচেয়ে দূরে যে: গুফরার আযাদ করা গোলাম ইবনে ওমর বলেন: মানুষের মধ্যে নিফাক থেকে সর্বাধিক দূরে সেই ব্যক্তি, যে নিজের ব্যাপারে সর্বাধিক নিফাকির ভয় করে। যে মনে করে, তাকে এ থেকে মুক্তিদানকারী কিছু নেই। আর

তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হল: যাকে তার মধ্যে অনুপস্থিত গুণের প্রশংসা করা হলে, তার মন খুশি হয় এবং সে তা গ্রহণ করে নেয়।

- নিফাকি কান্না: চোখ দিয়ে অশ্রু বের হবে, কিন্তু অন্তর থাকবে শক্ত। সে বিনয় প্রকাশ করবে, কিন্তু সেই হবে সর্বাধিক কঠিন অন্তরের অধিকারী।
- যদি মুনাফিকরা ধ্বংস হয়ে যেত: হুযায়ফা রা: এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন: হে আল্লাহ! মুনাফিকদেরকে ধ্বংস করুন! তিনি বললেন: হে ভাতিজা! সব মুনাফিকরা যদি ধ্বংস হয়ে যেত, তাহলে তুমি রাস্তায় পথচারি স্বল্পতায় একাকিত্ব বোধ করতে।
- সত্যবাদী ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিফাকির আশংকা করে।
- নিফাক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় কেবল মুনাফিক। আর নিফাকির আশংকা করে শুধু মুমিন।

শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়া

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللـــه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“যাদেরকে লোকে বলেছিল, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছে, তাই তোমরা তাদেরকে ভয় করো। তখন এটা (এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে উঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।”

আল্লামা সা’দী বলেন: অর্থাৎ “লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে”। তারা এটা বলেছিল মুমিনদের মাঝে আতংক ও ভীতি ছাড়ানোর জন্য। কিন্তু এটা আল্লাহর উপর তাদের ঈমান ও ভরসাই বৃদ্ধি করেছে। তারা বলে উঠেছে: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ আমাদের

সকল বিপদের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক। বান্দার সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তারই দায়িত্বে এবং তিনিই তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখেন।

- সর্বদা স্মরণ রাখ:
  - যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নেই, তথা যে স্বীয় রব থেকে বিচ্ছিন্ন, আল্লাহ তার অভিভাবক, সাহায্যকারী বা কর্মবিধায়ক হবেন না।
  - আর যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে, নিজ প্রয়োজন তার থেকে চেয়ে নেয়, তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, নিজের বিষয়াদী নিজ রবের দিকে ন্যস্ত করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, দিকনির্দেশনা দেন, যেকোন দূরের বিষয়কে তার জন্য নিকটবর্তী করে দেন এবং তার জন্য যেকোন কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেন।
  - যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। আর যে আল্লাহর হক নষ্ট করে, আল্লাহ তাকে নষ্ট (বা ক্ষতিগ্রস্ত) করেন ।
  - যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ তাকে তার অধীন করে দেন। কিন্তু যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে সে মর্যাদাবান হয়।
  - যখন কেউ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ সকল মানুষের অনিষ্টের জন্য তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যান। কারণ সকল সৃষ্টির ভাল-মন্দ তার হাতে। সকলের অন্তর তার নিয়ন্ত্রণে। আর তার ব্যাপারে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ই ঘটবে। কারণ কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, খাতা শুকিয়ে গেছে।
  - মুমিনের অবস্থা: যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, তখন সকাল সন্ধা অন্তর তার সাথেই জুড়ে থাকে। সে আল্লাহর জন্যই দাঁড়ায়, আল্লাহর জন্যই বসে, আল্লাহর জন্যই কথা বলে। তার নড়াচাড়া, স্থিরতা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রতিটি কথায় আল্লাহর কথাই চিন্তা করে। প্রত্যেক এমন জিনিসের পিছু ছুটে, যাতে আল্লাহর ভালবাসা রয়েছে। সবশেষে যখন এই মহান ও উন্নত স্তরে পৌঁছে এবং আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করে, তখন সে দ্বিতীয় ফলটি লাভ করে, যা হল আল্লাহর ভালবাসার প্রতিফল।

- জনৈক আলেম বলেন: মুমিন বান্দা যখন আল্লাহকে ভালবাসে, তখন সে তার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যেই আল্লাহকে সম্পৃক্ত করে।
- যে নিজ প্রয়োজনাদি পূরণে, আল্লাহর নিকট যে বিনিময় রয়েছে তা লাভের জন্য এবং আশংকাজনক ও কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয় যান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللـــه فَهُوَ حَسْبُهُ "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"

- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে তোমার অন্তরকে যুক্ত করো না: কিছু মানুষের অন্তর আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত নয়; বরং অমুক কর্মকর্তা, অমুক বন্ধু বা কয়েকটা পৃষ্ঠা পূর্বে লিখেছে, সেগুলোর সাথে বা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের সাথে বা শেয়ারের ফলাফলের প্রতীক্ষা বা এজাতীয় বিষয়ের সাথে জড়িত। কিন্তু আল্লাহর থেকে কোন কিছু পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে না তাদের মন। আর কিছু মানুষ উপকরণকে অনর্থক মনে করে, ফলে কোন উপকরণই অবলম্বন করে ন। বস্তুত সবচেয়ে বড় উপকরণ হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।
- আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কিছু নমুনা: ইয়ারমুকের যুদ্ধের বছর যখন আবু উবায়দা রা: কাফেরদের সঙ্গে লড়ার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে ওমর রা: বরাবর পত্র পাঠালেন এবং তাকে অবগত করলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে এত সংখ্যক শত্রু জমা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে লড়ার মত সামর্থ তাদের নেই। যখন তার পত্র পৌঁছলো, সব মানুষ কাঁদতে লাগল। সবচেয়ে বেশি কাঁদছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা:। তিনি স্বয়ং ওমর রা:কে যুদ্ধে বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন। ওমর রা: মনে করলেন, এটা সম্ভব নয়। তাই তিনি আবু উবায়দা রা: কে লিখলেন: মুসলিমের উপর যত বিপদই আসুক না কেন, সে যদি আল্লাহর নিকট থেকে তা সমাধান করাতে চায়, তাহলে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন এবং সমাধান করে দেন। তাই আমার পত্র তোমার নিকট পৌঁছলে তুমি আল্লাহর সাহায্য চেয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিবে।

- অনেক মানুষের হিসাবের পাল্লায় ওমর রা: এর অবস্থানটিকে আত্মঘাতি ও নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া মনে হবে। কিন্তু ওমর রা: বিশ্বাস করতেন যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আর যেহেতু তার অন্তর আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত ছিল, এজন্য তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট চেয়েছেন, একমাত্র তার সাথেই সম্পর্ক করেছেন, যদিও সামর্থ্যমত উপকরণও অবলম্বন করতেন। আর পত্র আসার সেই কঠিন মুহূর্তটিতেও তিনি সেই বাস্তবতাকে ভুললেননি, যার দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি স্মরণ করলেন, আল্লাহই সকল বিষয়ের উর্ধ্বে, তিনিই সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি পরিপূর্ণ আস্থা ও গভীর ঈমানের সাথে একথা বলেছিলেন।
- উন্নত মনোবল:

এটাই সেই বস্তু, যা বান্দাকে এমন উন্নত মানুষে পরিণত করে , যার ফলে তার পা থাকে মাটিতে, আর আত্মা ও অন্তর যুক্ত থাকে আল্লাহর সঙ্গে।

এটাই বান্দাকে এমন উন্নত মানুষে পরিণত করে, যার ফলে প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই তার অন্তর আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত থাকে। সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না, আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট আশা করে না, আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নত হয় না, আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট কিছু চায় না, আল্লাহ ব্যতীত কারো সাহায্য প্রার্থনা করে না। তার সকল বিষয় আল্লাহ সঙ্গে যুক্ত থাকে। কোন মানুষ ও দুনিয়ার কোন শক্তির প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে না। দুনিয়ার বস্তুরাজি তার সংকল্প, দৃঢ়তা, ঈমান ও ইয়াকীনকে একটুও টলাতে পারে না।

হাদিসের মধ্যে রয়েছে... জেনে রেখ, যদি সকল মানুষও একত্রিত হয়ে তোমাকে কোন উপকার করতে চায়, তথাপি আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার চেয়ে বেশি কোন উপকার করতে পারবে না। অনুরূপ যদি সকল মানুষ তোমার কোন ক্ষতি করতে একত্রিত হয়, তাহলেও আল্লাহ যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তার থেকে অধিক কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, খাতা শুকিয়ে গেছে।

আল্লাহ শপথ! কোন বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ব্যর্থ হবে না। আর যাকেই আল্লাহ বিপদে তার নিকট দু'আ করার তাওফীক দান করেছেন, তার দু'আ অবশ্যই কবুল হবে এবং তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।

- বদর যুদ্ধ ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক: উপকরণের অবস্থান যত উর্ধ্বেই পৌঁছে যাক না কেন, তা উপকরণ হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তার সঙ্গে অন্তর যুক্ত করা উচিত নয় বরং সেই আল্লাহর সঙ্গে অন্তর যুক্ত করা উচিত, যার মালিকানাধীন আকাশম-লী ও পৃথিবী। আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে মুসলিমদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার কথা আলোচনা করতে গিয়ে এই বাস্তবতার প্রতিও গুরুত্ব দিয়ে বলেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللـــه إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللـــه إِنَّ اللـــه عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"(স্মরণ কর,) যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিল, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন। (বললেন:) আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফেরেশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এজন্যই দিয়েছেন, যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।"

সুতরাং ফেরেশতাগণ হলেন মাধ্যম মাত্র। অন্তর তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয়; বরং অন্তর যুক্ত হবে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে।

- বাস্তব প্রশিক্ষণ: কেন জীবনের শুরুতেই তোমার সন্তানকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়াতে শিখাবে না?

সে যখন কোন উপকারী জিনিস চাইবে, কিন্তু তুমি তা দিতে পারবে না, তখন তুমি তাকে বলবে: বৎস! চল, আমরা দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট চাই। কারণ আল্লাহই রিযিকদাতা। তিনিই আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থাপক। আর তিনি যদি তোমাকে এটা এনে দেওয়ার মত অর্থ আমাকে না দেন, তাহলে বুঝতে হবে এটা এখন আমাদের জন্য উপকারী নয়। কারণ আল্লাহই এটা আমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন।

নেককারদের উপদেশ সমগ্র থেকে কয়েকটি

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللـــه إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

“(স্মরণ কর,) যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল: বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক ভয়ংকর জুলুম।”

- আল্লামা সা’দী রহ: বলেন: তাকে উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে কতগুলো আদেশ-নিষেধ পালনের উপদেশ দেন। ইখলাসের আদেশ করেন, শিরক করতে নিষেধ করেছেন। অত:পর এর কারণও স্পষ্ট করে বলেন: “নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় জুলুম।”

  এটা বড় হওয়ার কারণ হল: এরচেয়ে নিকৃষ্ট ও মারাত্মক কিছু হতে পারে না, যে মাটি থেকে সৃষ্ট কোন বস্তুকে সকল বস্তুর মালিকের সাথে সমান করে ফেলে, যে কোন ক্ষমতার অধিকারী না, তাকে সকল ক্ষমতার অধিকারীর সাথে সমান করে ফেলে, সর্ব দিক থেকে পরমুখাপেক্ষী ও অসম্পূর্ণ সত্তাকে, সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ ও অমুখাপেক্ষি সত্তার সাথে সমান করে ফেলে।

- সর্বদা নেকের নিয়ত কর: ইমাম আহমাদের পুত্র আব্দুল্লাহ তার বাবাকে বললেন: হে আব্বা! আমাকে উপদেশ দিন! তিনি বললেন: তুমি নেকের নিয়ত রাখবে, কারণ যতক্ষণ তুমি নেকের নিয়ত রাখবে, ততক্ষণ নেকেরই সওয়াব লাভ করবে।
- কিভাবে আল্লাহ তোমাকে সম্মান দান করবেন? এক ব্যক্তি হাসান বসরী রহ: কে বললেন: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তুমি আল্লাহর হুকুমকে সম্মান কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে সম্মান দান করবেন ।
- ভালবাসা, ভয় ও আশা: এক ব্যক্তি তাউসকে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি: তুমি আল্লাহকে এমনভাবে ভালবাসবে, যে কোন জিনিস তোমার নিকট তার থেকে প্রিয় না থাকে। তাকে এমন ভয় করবে যে, তোমার নিকট তার থেকে ভয়ের আর কিছু থাকবে না। আল্লাহর প্রতি এমন আশা করবে যে, এই আশা তোমার মাঝে ও উক্ত ভয়ের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। আর তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অন্য মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে।
- আল্লাহর কিতাব: জনৈক ব্যক্তি উবাই ইবনে কা'বকে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণীয় হিসাবে আকড়ে ধর এবং তাকে বিচারক ও ফায়সালকারী মান।
- ফেরেশতা হয়ে যাও: জনৈক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি কে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি: তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে ফেরেশতা হয়ে যাও। লোকটি বলল: এটা কিভাবে? তিনি বললেন: দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন কর।
- সবচেয়ে বড় উপদেশ: ইবনে তাইমিয় রহ: কে একজন পশ্চিমা লোকের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হল: লোকটি বলল: হে শায়খুল ইসলাম আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তুমি আমার নিকট ওসিয়ত চাচ্ছো! তাহালে শোন, আল্লাহর কিতাব থেকে বড় উপদেশ আর কিছু নেই, যে তা চিন্তা ও অনুধাবন করে-

وَلِلَّــهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّــهَ

"আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি, যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।"

এটাই হল বড় উপদেশ। এটাই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য, তথা আল্লাহকে ভয় কর।

- সতর্ক হও, সতর্ক হও: জনৈক ব্যক্তি ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তুমি ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাক, যারা নেককার লোকদের সাথে মিশে, কিন্তু তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, অথবা যারা গুনাহকারীদেরকে ভর্ৎসনা করে, কিন্তু নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। অথবা যারা প্রকাশ্যে শয়তানকে অভিশম্পাত করে, কিন্তু গোপনে শয়তানের অনুসরণ করে।
- সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর: জনৈক যুবক আবুদ দারদা রা: এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: হে বৎস! তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, তাহলে আল্লাহকে তোমাকে দু:খের সময় স্মরণ করবেন।
- অন্তরের চিকিৎসা: ইবরাহিম আলখাওয়াস বলেন: অন্তরের চিকিৎসা পাঁচটি জিনিসের মধ্যে: চিন্তার সাথে কুরআন পাঠ করা, পেট খালি থাকা, রাত্রি জাগরণ করা, শেষ রাতে অনুনয় বিনয় করা এবং নেককার লোকদের সাথে বসা।
- ভদ্রতা কি? মুহাম্মাদ ইবনে আলীকে জিজ্ঞেস করা হল: ভদ্রতা কি? তিনি উত্তর দিলেন: গোপনেও এমন কোন কাজ না করা, যেটা করতে প্রকাশ্যে লজ্জাবোধ কর।

- মানুষের জন্য কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

"বল, আমি এর কারণে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি ভনিতাকারীদের অন্তর্ভূক্ত নই।"

আল্লামা সা'দী রহ: বলেন: অর্থাৎ এমন দাবি করি না, যা আমার মধ্যে নেই এবং যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ি না। আমি শুধু আমার নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়, তারই অনুসরণ করি।

ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদেরকে লৌকিকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আসমা রা: থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতিন আছে। তাই আমি যদি আমার স্বামী থেকে যা পাইনি, তার ব্যাপারে পরিতৃপ্তি (অর্থাৎ পাওয়ার ভাব) প্রকাশ করি, তাহলে কি কোন গুনাহ হবে? রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: যে কৃত্রিমতা করে অপ্রাপ্ত বিষয়ের পরিতৃপ্ততা প্রকাশ করে, সে দুই মিথ্যার পোশাক পরিধানকারীর ন্যায়। (বুখারী মুসলিম)

ইমাম নববী রহ: বলেন: হাদিসের শব্দ- আলমুতাশাব্বি- অর্থ হল যে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে, অথচ আসলে সে পরিতৃপ্ত নয়। এখানে তার অর্থ হল, সে প্রকাশ করবে যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, অথচ তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর দুই মিথ্যার পোশাক পরিধানকারী মানে হল: যাহেদ, আলেম বা সম্পদশালীদের পোশাক পরিধান করে মানুষের নিকট মিথ্যা প্রকাশ করল। যেন মানুষ প্রতারিড়ত হয়, অথচ সে উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

নেককারদের বৈশিষ্ট্য হল তারা এমন কোন কথ বলেন না, এমন কোন কাজ করেন না, এমন কোন গুণ প্রকাশ করেন না এবং কোন ইবাদতের দাবি করেন না, যার গভীর হাকিকত তাদের অন্তরে নেই। তাই তারা মানুষের সামনে নিজেদের মন্দগুলো গোপন রেখে নেকগুলো শুধু প্রকাশ করে বেড়ান না।

সালাফগণ তাদের অবস্থা গোপন রাখতেন এবং কৃত্রিমত বর্জন করার উপদেশ দিতেন।

- কৃত্রিমতার কিছু নমুনা:

ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: এক যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে মাথা নিচু করে আছে। তিনি বললেন: এই! মাথা উচু কর। বিনয় অন্তরে যতটুকু আছে, ততটুকুই, মাথা নিচু করার দ্বারা তা বেড়ে যাবে না। যে অন্তরে যতটুকু নিবয় আছে, তার থেকে বেশি প্রকাশ করল, সে নিফাকির উপর নিফাকি প্রকাশ করল।

কাহমাস ইবনে হাসান থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক ওমরের নিকট এমনভাবে শ্বাস নিল যেন সে চিন্তিত। ওমর রা: তাকে কিল দিলেন।

- রিয়া বা লোক দেখানো একটি কৃত্রিমতা: তথা হচ্ছে ছোট রিয়া। যেমন মাখলুকের জন্য কৃত্রিমতা করা, ইবাদতে আল্লাহর জন্য ইখলস অবলম্বন না করা। বরং কখনো আত্মিক স্বার্থের জন্য বা কখনো দুনিয়া অর্জনের জন্য করা।
- তুমি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার সময়কে স্মরণ কর: মাখলুকের জন্য লৌকিকতা করা, মাখলুকের প্রশংসা কুড়ানো, মাখলুকের প্রশংসা কামনা করা বা এজাতীয় বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে; শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকেই উদ্দেশ্য বানাবে। আর কিয়মাতের দিন আল্লাহর সামনে দ-ায়মান হওয়ার কথা স্মরণ করবে, যেদিন সকল গোপন বিষয়সমূহের যাচাই বাছাই হয়ে যাবে। ফলে তার কোন শক্তি বা সাহায্যকারী থাকবে না।
- অতিরিক্ত কৃত্রিমতা: অনেকে আছে, তার কোন আত্মীয় তার সাক্ষাতে আসলে তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত লৌকিকতা করে। অনেক মাল খরচ করে। তাকে

ইকরাম করতে গিয়ে নিজেকে অনেক কষ্টের মধ্যে ফেলে। অথচ অনেক সময় স্বল্প আয়ের লোক হয়ে থাকে। এটা রাসূলুল্লাহ সা: এর আদর্শ পরিপন্থি।

- কৃত্রিমতার কতিপয় আলামত:

ইলম ছাড়া বানিয়ে কথা বলা। মাসরুক বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট গেলাম। তিনি বললেন: হে লোকসকল! যে একটি বিষয় সম্পর্কে জানে, সে ই যেন তা বলে। আর যে জানে না, সে যেন বলে দেয়, আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ এটাও একটি ইলম যে, কেউ না জানলে বলে দিবে "আল্লাহই ভাল জানেন"। আল্লাহ তা'আলা তার নবী সা:কে বলেন: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

ছন্দ মিলানো: ইবনে আব্বাস রা: বলেন: তারা যদি তোমাকে আমির বানায়, তাহলে তাদের আগ্রহ থাকাবস্থায় তাদের নিকট হাদিস বলবে। আর দেখ, দু'আর মধ্যে ছন্দ মিলানো থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা: এবং সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি, তারা এটা থেকে বেঁচে থাকতেন।" ইমাম গাযালী রহ: বলেন: কৃত্রিমতার সাথে যে ছন্দ মিলানো হয়, সেটা হচ্ছে মাকরুহ। কারণ কাকুতি-মিনতি ও বিনয় তো নিন্দিত নয়। অন্যথায় হাদিসে বর্ণিত দু'আ সমূহের মধ্যেও তো মিলানো মিলানো বাক্য রয়েছে, কিন্তু সেগুলো অকৃত্রিম।

ছড়ছড়ানো, অনর্গল বলতে থাকা এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ করা: ছড়ছড়ানো মানে হচ্ছে, লৌকিতা করে সত্য থেকে বের হয়ে গিয়ে অধিক কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও কিয়মাতে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী আসনে থাকবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চরিত্রের অধিকারীগণ। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও কিয়মাতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরের আসনে থাকবে অধিক কথোপকথনকারী বাচালরা।

ইমাম আসকারী বলেন: এখানে রাসূলুল্লাহ সা: এর উদ্দেশ্য হল: ভ্রান্ত বিষয়াদীর অনেক গভীরে ঢোকা থেকে নিষেধ করা আর লৌকিকতার সাথে বাগ্মিতা ও বাকপটুত্বের নিন্দা করা আর তার বিপরীতটির প্রশংসা করা।

- মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) "তোমার প্রভুর ইবাদত করতে থাক, নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আসার আগ পর্যন্ত।"

আল্লামা সা'দী রহ: বলেন: অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সময় বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লহর নৈকট্য অর্জন করতে থাক। রাসূল সা: তার রবের আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। তার প্রভুর পক্ষ থেকে নিশ্চিত বিষয় তথা মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত তার রবের ইবাদতে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রতিটি সত্যিকার মুসলিমের জন্য আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকা একটি মৌলিক লক্ষ্য: অর্থাৎ দৃঢ়তা ও সতর্কতার সাথে সিরাতে মুস্তাকীমে চলা। বিশেষত: এই যামানায়, যখন সর্বপ্রকার ফেৎনা ও কুপ্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

- দৃঢ় থাকার উপায়সমূহ:

১. কুরআনের দিকে মনোযেগী হওয়া। আলকুরআনুল আযীমই হল দৃঢ় থাকার প্রথম মাধ্যম। এটা হল আল্লাহর মজবুত রশ্মি এবং স্পষ্ট আলো। যে এটাকে আকড়ে ধরবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন, যে এর অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দিবেন এবং যে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে, আল্লাহ তাকে সঠিক পথের দিশা দিবেন।

২. আল্লাহর শরীয়তের সাথে লেগে থাকা এবং তার উপর আমল করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يُثَبِّتُ اللـــه الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللـــه الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللـــه مَا يَشَاء

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার উপর স্থিতি দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। আর আল্লাহ জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আর আল্লাহ (নিজ হিকমতে) যা চান, তাই করেন।”

ইমাম কাতাদা রহ: বলেন: আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ও নেক আমলের দ্বারা দৃঢ় করবেন এবং পরকালীন জীবনে তথা কবরে দৃঢ় করবেন।

৩. দু’আ হল আল্লাহর মুমিন বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য। তারা দু’আর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, যেন আল্লাহ তাদেরকে অবিচল রাখেন– (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)

“হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দান করেছো, এরপর আর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না।”

রাসূলুল্লাহ সা: বেশি বেশি এই দু’আ করতেন: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) “হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখ।” (বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী)

৪. আল্লাহকে স্মরণ করা: আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে এই দু’টি বিষয়কে কিভাবে এক সাথে আনা হয়েছে চিন্তা করে দেখুন:

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللـــه كثيرا لعلكم تفلحون

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের মুখোমুখী হও, তখন অটল থাক এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো, হয়ত তোমরা সফল হবে।”

তাহলে এটাকে জিহাদে অটল থাকার সবচেয়ে বড় উসিলা বানিয়েছেন।

৫. ভাল পরিবেশ এবং ঈমানী পরিবেশ তৈরী করা: নেককারদের সঙ্গে আলোচনা কর এবং তাদের নিকট যাওয়া দ্বীনের উপর অটল থাকতে বড় সহায়ক।

- দুই সমাপ্তির মাঝে পার্থক্য:

কাফের ও পাপিষ্ঠরা সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদের মুহূর্তে দৃঢ়তা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে তারা মৃত্যুর সময় শাহাদাত উচ্চারণ করতে পারবে না। নাউযু বিল্লাহ!

- মন্দ পরিসমাপ্তির কিছু নমুনা:

জনৈক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় বলা হল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন! তখন সে তার মাথা ডানে বামে নাড়িয়ে তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আরেকজন তার মৃত্যুর সময় বলতে লাগল: এটা ভাল অংশ। এটার দাম সস্তা।

আর আরেকজন মৃত্যুর সময় দাবার গুটির নাম উল্লেখ করছিল।

চতুর্থ আরেকজন সুর, গানের কিছু শব্দ এবং প্রেমিকার স্মরণ করছিল।

এর কারণ হল এ জিনিসগুলো তাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে ভিন্ন কাজে ব্যস্ত রেখেছিল।

পক্ষান্তরে দ্বীন ও নেক আমলের অধিকারী লোকদেরকে আল্লাহ মৃত্যুর সময় দৃঢ়তা দান করেন এবং উত্তম পরিসমাপ্তি দান করেন।

- উত্তম পরিসমাপ্তির আলামত: কালিমা উচ্চারণ করতে পারা। কখনো চেহারা লাল হতে দেখা যাবে বা সুঘ্রাণ ছড়াবে বা তাদের আত্মা বের হওয়ার সময় কোন সুসংবাদ পাওয়া যাবে।

- নেককারদের জীবনের গোপন রহস্যাবলী:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) "তোমরা তোমাদের রবকে ডাক বিনিতভাবে ও চুপিস্বারে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"

ইমাম তবারী রহ: বলেন: আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন: হে লোকসকল! তোমরা যেসকল বহু উপাস্য ও মূর্তিসমূহকে ডাক সেগুলোকে বাদ দিয়ে এককভাবে তোমাদের প্রভুকে ডাক, শুধুমাত্র তার নিকটই দু'আ কর। বিনয় নম্রতা ও দীনতার সাথে, গোপনে, অর্থাৎ আন্তরিক বিনয় ও তার একত্বাবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে। এমন নয় যে, উচ্চ স্বরে ও ঝগড়া করার মত ডাকবে, অথচ অন্তরে আল্লাহর প্রভুত্ব ও একত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে না। যা মুনাফিক ও ধোকাবাজদের কাজ।

যেমন হাসান বসরী রহ: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি পুরো কুরআন জমা করেন, কিন্তু তার প্রতিবেশী তা টেরও পেত না।

আরেক ব্যক্তি অনেক ফিকহ শিখেছে, কিন্তু মানুষ তা জানত না।

আরেক ব্যক্তি নিজ ঘরে দীর্ঘ সময় নামায পড়ত আর তার ঘরে মেহমান থাকত, কিন্তু তারা তা টের পেত না।

আমরা এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা দুনিয়ার যেকোন আমল গোপনে করতে পারলে তা আর কখনো প্রকাশ্য হত না।

একসময় মুসলিমগণ অনেক জোড়ালো দু'আ করতেন, কিন্তু তাদের কোন আওয়ায শোনা যেত না। শুধু তাদের মাঝে ও তাদের রবের মাঝে ফিস ফিস আওয়ায হত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: তোমরা মিনতির সাথে গোপনে তোমাদের প্রভুকে ডাক। আল্লাহ তা'আলা তার এক বান্দার কথা আলোচনা করে তার কাজের প্রশংসা

করেন এই বলে: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا "যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল চুপিস্বারে।"

একনিষ্ঠ বান্দারা তাদের নেক আমলকে অন্যদের থেকে গোপন করতে অনেক আগ্রহী থাকতেন। পক্ষান্তরে অন্যরা তাদের গুনাহগুলোকে গোপন করতে আগ্রহী থাকতো। সেই কল্যাণ লাভের আশায়, যা হাদিসে এসেছে- আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী ও গোপনে তার ইবাদতকারী বান্দাদেরকে ভালবাসেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম।)

ইমাম খুরাইয়ী বলেন: তারা এটা পছন্দ করতেন যে, এক ব্যক্তির নেক আমলের এমন গোপন একটি অংশ থাকুক, যা তার স্ত্রী বা অন্য কেউও জানবে না।

- তোমার নেক আমল গোপন কর: সালামা ইবনে দিনার বলেন: তুমি তোমার মন্দ আমলগুলোকে যেরূপ গোপন কর, তোমার নেক আমলগুলোকে তার থেকে অধিক গোপন কর।

বিশর আলহাফি বলেন: তুমি অখ্যাত থাক এবং হালাল খাবার আহার কর। সেই ব্যক্তি পরকালে স্বাদ লাভ করবে না, যে দুনিয়াতে মানুষের নিকট পরিচিত হতে চায়।

মুহাম্মদ ইবনুল আলা বলেন: যে আল্লাহকে ভালবাসে, সে এটাও ভালবাসে যে, মানুষ তাকে না চিনুক।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার বলেন: কোন স্বাদ উপভোগকারী নিভৃতে আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাত করার মত স্বাদ উপভোগ করেনি।

- সালাফদের ইবাদত গোপন করার কিছু নমুনা:

বর্ণিত আছে, ওমর রা: গভীর রাতে বের হলেন। হযরত তালহা রা: তাকে দেখে ফেললেন। ওমর রা: একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তারপর সেখান থেকে বের হয়ে

আরেকটি ঘরে প্রবেশ করলেন। সকালবেলা তালহা সেই ঘরে গেলেন। সেখানে দেখলেন এক অন্ধ অচল বৃদ্ধা। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন: এই লোকটি কি কারণে তোমার ঘরে আসে? মহিলা বলল: লোকটি এত এত দিন ধরে আমাকে দেখাশোনা করছে। আমার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র এনে দেয়। আমার অসুবিধা হলে দূর করে। তখন তালহা রা: বললেন: ধ্বংস তোমার হে তালহা! তুমি ওমরের দোষ-ত্রুটির পিছনে পড়েছো?!

যায়নুল আবিদীন আলী ইবনে হাসান মদীনার একশ পরিবারের লোকদের খরচ বহন করতেন। রাতের বেলা তাদের নিকট খাবার নিয়ে আসতেন। তারা মৃত্যু পর্যন্ত জানত না, কে তাদের নিকট খাবার নিয়ে আসে। মৃত্যুর পর তারা অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, এগুলো যায়নুল আবিদীনের পক্ষ থেকে আসতো। বিধবাদের ঘরে খাদ্য বহনের কারণে তারা তার পিঠে চিহ্ন দেখতে পেল।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি বলেন: যদি কেউ ২০ বছরও নিজ ঘরে কাঁদে, আর তার স্ত্রীও একই ঘরে থাকে, তবুও সে তা জানবে না।

ইবনুল মুবারক রহ: যুদ্ধের সময় তার চেহারায় পর্দা দিতেন, যাতে কে তাকে না চিনে।

ইমাম আহমাদ রহ: বলেন: আল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ: কে এত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন শুধু তার গোপন আমলের কারণে।

ইমাম শাফেয়ী রহ: বলেন: আমি কামনা করি, সমস্ত মানুষ এই ইলম শিখুক, কিন্তু তারা তা আমার দিকে সম্পৃক্ত না করুক।

- একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী: এই গোপন করা শুধু ঐ সমস্ত আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেগুলোতে গোপন করা শরীয়তসিদ্ধ। আর তা শুধু নাওয়াফেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফরজের ক্ষেত্রে নয়। উপরন্তু আলেমগণ এর থেকে ঐ সকল

লোকদেরকে পৃথক করেছেন, যাদেরকে মানুষ অনুসরণ করবে। কারণ তার ক্ষেত্রে প্রকাশ করাই ভাল।

- সালিহদের কিছু বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللــه فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه)"তারাই ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। তাই তুমি তাদের পথেরই অনুসরণ কর।"

মুমিনদের কর্তব্য হল, সালিহদের বৈশিষ্ট্যাবলী জানা, তাদের জীবনী অধ্যয়ন করা, তাদের উন্নত চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ করা।

- তাবিয়ীদের শিরোমণি সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ: এর কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য:

তিনি বলেন: আমার ত্রিশ বছর এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, মুআয্যিন আযান দেওয়ার সময় আমি মসজিদে উপস্থিত।

তিনি বলেন: চল্লিশ বছর যাবত আমার জামাতে নামায ছুটেনি।

- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

১. তিনি নির্জনতা ভালবাসতেন। ইমাম আহমাদ বলেন: আমি নির্জনতাকেই আমার অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিদায়ক মনে করি।

২. তিনি প্রসিদ্ধিকে অপছন্দ করতেন: মারওয়াযী বলেন: ইমাম আহমাদ আমাকে বললেন: তুমি আব্দুল ওয়াহ্হাবকে বল, যে তুমি অখ্যাত থাক। কারণ আমি প্রসিদ্ধির ফেৎনায় আক্রান্ত হয়েছি।

৩. তাকে মানুষ সম্মান করুক, তিনি এটা অপছন্দ করতেন না: মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে দেখেছি, তিনি যখন রাস্তায় হাটতেন, তখন কেউ তার পিছু পিছু হাটলে তিনি তা অপছন্দ করতেন।

৪. তার বিনয়: খুরাসানী তাকে বলেন: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে, আপনাকে দেখার তাওফীক দান করেছেন। তিনি বললেন: বস, এটা কি!? আমি কে!? আরেক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত: আমি আবু আব্দুল্লাহর চেহারায় চিন্তার রেখা দেখতে পেলাম। আর এর কারণ ছিল এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করে বলেছিল: আল্লাহ আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

৫. তার রাত্রি জাগরণ: মারওয়াযী বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে দেখলাম, তিনি তার নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অর্ধরাত্রির মত জাগরণ করলেন, যা প্রায় সাহরীর সময় পর্যন্ত হয়ে গেল।

৬. মুসলিম ভাইদের জন্য তার দু'আ: আব্দুল্লাহ বলেন: আমি অনেক সময় বাবাকে দেখেছি, বিভিন্ন কওমের জন্য নাম ধরে ধরে দু'আ করতেন। তিনি অনেক বেশি দু'আ করতেন এবং নিচু স্বরে করতেন। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়েও নামায পড়তেন।

৭. তার স্বল্পনিদ্রা: তিনি এশার নামায পড়ার পর উত্তমরূপে কয়েক রাকাত নামায পড়তেন। তারপর বিতর পড়ে হালকা ঘুমাতেন। তারপর আবার দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তার কেরাত হত কোমল ও মৃদু স্বরে। মাঝে মাঝে কিছু অংশ আমি বুঝতাম না।

৮. অধিক রোজাপালন: তিনি নিয়মিত অনেকদিন রোজা রাখার পর কিছুদিন রোজামুক্ত থাকতেন। তিনি সোমবার, বৃহ:বার ও আয়্যামে বীযের রোজা কখনো ছাড়তেন না। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিত রোজা রেখেছেন।

৯. দরীদ্রদের সম্মান করা: মারওয়াযী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইমাম আহমাদের মজলিস অপেক্ষা কোন মজলিসে দরীদ্রদের এত সম্মানের অবস্থায় দেখিনি। তিনি তাদের প্রতি ধাবিত ছিলেন আর দুনিয়াদারদের থেকে বিরাগী ছিলেন।

১০. তার স্বল্পকথন: তিনি যখন আসরের পর ফাতওয়া প্রদানের জন্য স্বীয় মজলিসে বসতেন, তখন কোন প্রশ্ন করার আগে তিনি কথা বলতেন না।

১১. তার উত্তম চরিত্রের কিছু চিত্র: তিনি হিংসাপরায়ণ বা তরিৎপ্রবণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যধিক বিনয়ী, উত্তম চরিত্রবান, সহনশীল, সদা উজ্জলমুখ, নম্র, কোমল। কোন কঠোরতা ছিল না তার মাঝে। প্রতিবেশীদের কষ্ট সহ্য করতেন।

১২. আল্লাহর সম্মানের প্রতীকসমূহকে সম্মান করতেন: তিনি আল্লাহর জন্যই ভালবাসতেন, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করতেন। আর যখন কোন দ্বীনি বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটত, তখন তার ক্রোধ হত কঠিন।

- ইমাম বুখারী রহ:এর কিছু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য:

ইমাম বুখারী রহ: এর অন্যান্য অনেক প্রশংসনীয় গুণাবলীর মাঝে বিশেষভাবে তিনটি গুণ উল্লেখযোগ্য:

১. তিনি ছিলেন: স্বল্পভাষী।

২. মানুষের জিনিসের প্রতি লোভী ছিলেন না।

৩. মানুষের বিষয়াদী নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। তার একমাত্র ব্যস্ততা ছিল ইলম।

প্রবল-দুর্বলের মাঝে কোন পার্থক্য করতেন না: আব্দুল মাজীদ ইবনে বুখারী বলেন: আমি সবল-দুর্বলের মাঝে সমতাকারী ইমাম বুখারীর মত কাউকে দেখিনি।

যবানের হেফাজত: ইমাম বুখারী রহ: বলেন: আমি যখন থেকে জানি যে, গীবত গীবতকারীর জন্য ক্ষতিকর, তখন থেকে কখনো কারো গীবত করিনি।

তার রাতের ইবাদত: তিনি শেষ রাতে ১৩ রাকাত নামায পড়তেন।

- সালিহদের সার্বক্ষণিক অভ্যাস:

শায়খুল ইসলাম বলেন: তাদের উল্লেখযোগ্য সার্বক্ষণিক অভ্যাসগুলো হল:

- আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করা ও সর্বদা কাকুতি মিনতি করা
- হাদিসে বর্ণিত দু'আ শিখে তা দ্বারা দু'আ করা এবং দু'আ কবুলের সম্ভাব্য সময়গুলোতে- যেমন, শেষ রাতে, আযান-ইকামতের সময়, সিজদায় ও নামাযের পরে দু'আ করা।
- এর সাথে ইস্তেগফারও করা, কারণ কেউ ইস্তেগফার করত: আল্লাহর প্রতি রুজু হলে আল্লাহ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত উত্তম ভোগ-সামগ্রী দান করেন।
- দিনের শুরুতে, শেষে এবং ঘুমের সময় নিয়মিত যিকরের অভ্যাস করা।
- যে সমস্ত বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ এতে আল্লাহ তার নিজ শক্তি দ্বারা তাকে সাহায্য করেন এবং তার অন্তরের গভীরে ঈমান গেঢ়ে দেন।
- ফরজসমূহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার প্রতি যতœবান হওয়া, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কারণ এগুলো হল দ্বীনের খুটি।
- সর্বদা সব কাজে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ জপতে থাকা। কারণ এর মাধ্যমে সে গুরুদায়িত্ব পালন, বিপদ মোকাবেলা করা ও উন্নত মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে।
- দু'আ ও প্রার্থনায় অলসতা না করা। কারণ বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাড়াহুড়া করে একথা না বলে যে, আমি দু'আ করলাম, কিন্তু দু'আ কবুল হল না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দু'আ কবুল হয়।
- আর বিশ্বাস করবে যে, বিজয় ধৈর্যের মাঝে এবং সফলতা কষ্টের সাথে। আর সংকটের সাথেই সচ্ছলতা রয়েছে। নবী বা অন্য কেউ সবর ব্যতীত ভাল ফলাফল লাভ করতে পারেনি। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

সংশোধিত হওয়া ও সংশোধন করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)

"মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। সব কিছু ঠিকঠাক রাখবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।"

আরেক স্থানে বলেন:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللــــه عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"আমার এমন কোন ইচ্ছা নেই যে, আমি যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা তোমাদের পিছনে গিয়ে নিজেই করতে থাকবো। নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি যা কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি। আমি তারই উপর নির্ভর করেছি এবং তারই দিকে ফিরি।"

তাই কোন ব্যক্তিগত বা অন্যকে প্রভাবিতকারী ইবাদতই সংশোধিত হওয়া ও সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত নয়। বিশেষত: যে সকল ইবাদতের উদ্দেশ্যই ইসলাহ বা সংশোধণ করা। যেমন আমর বিল মারুফ, নেহি আনিল মুনকার। তাই আমর বিল মারুফম, নেহি আনিল মুনকার ও সমস্ত সৃষ্টিজীবের কল্যাণকামনা করা ঈমনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যা আহলে হক, তথা নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য। তাদের প্রধান কাজই ছিল আমর বিল মারুফ, তথা তাওহীদ, ইনসাফ ও উন্নত আখলাকের অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করা এবং নেহি আনিল মুনকার, তথা যমীনে শিরক, অবাধ্যতা, জুলুম ও ফ্যাসাদ হতে বাঁধা দেওয়া।

- আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকারের গুরুত্ব: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّـــه عَاقِبَةُ الأُمُورِ

"যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।"

আরেক স্থানে বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্য হতে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সফল।

- হযরত লুকমানের স্বীয় সন্তানের প্রতি উপদেশের ঘটনা বর্ণনা করত: বলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় কাজে নিষেধ করো এবং তোমার উপর যে বিপদ আপতিত হয়, তার উপর সবর করো। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

এক্ষেত্রে আমাদের নবী সা: এর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি তার উম্মতকে সর্বপ্রকার ভালকাজের আদেশ করেছেন এবং সর্ব প্রকার মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: তোমাদের মধ্যে যে কোন মন্দ কাজ দেখতে পায়, সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়, যদি তা না পারে, তাহলে যেন মুখ দ্বারা

বাঁধা দেয়, যদি তাও না পারে, তাহলে যেন অন্তর দ্বারা বাঁধা দেয়। আর এটা হল সর্বচেয়ে দূর্বল ঈমান। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

- সমাজ সংশোধন: ড.আব্দুল কারীম যিদান বলেন: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হল, তাতে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ প্রতিটি সদস্যের মাঝে সমাজ সংশোধন, যথাসম্ভব তা থেকে ফ্যাসাদ দূর করণ এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অন্যের সাথে সহযোগীতামূলক অংশ গ্রহণের আগ্রহ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

  "তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সহযোগীতা করো আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে অকে অন্যের সহযোগীতা করো না।"

- সবচেয়ে বড় পারস্পরিক সহযোগীতা হল: সমাজ সংশোধনে পরস্পরে সাহায্য করা। যখন একজন ব্যক্তি সমাজ সংশোধনে আগ্রহী থাকবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا) "এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশান্তি বিস্তার করো না।"

  তাই মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরস্পর সহযোগীতামূলক সমাজ সংশোধন, কল্যাণ বিস্তার ও নৈরাজ্য মোকাবেলায় কাজ করে। ঐ সকল মুনাফিকদের বিপরিত, যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সংশোধন করার দাবি করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

  وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالواإنما نحن مصلحون ألاإنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون

“তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী।”

- মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য: আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ করে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করে।”

আর মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রশংসা বলেন:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ একের অন্যের মতই। তারা অন্যায়ে কাজের আদেশ করে এবং সৎ কাজে নিষেধ করে।”

- আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারে সালিহীনের অবদানসমূহ:

১. আলী ইবনে আবি তালিব রা: বলেন: হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হওয়ার কারণ হল: তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে, আর তাদের মধ্যে যারা আল্লাহওয়ালা ও আলেম ছিল, তারা তাদেরকে বাঁধা দেয়নি। তাই আল্লাহ তা’আলা তাদের সকলের প্রতি তার শাস্তি অবতীর্ণ করেন। তাই তাদের উপর যেরূপ শাস্তি এসেছিল, তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার করতে থাক। জেনে রাখ, আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার কারো রিযিক কমায় না এবং কারো মৃত্যু তরান্বিত করে না।

২. সুজা ইবনুল ওয়ালীদ বলেন: আমি সুফিয়ানের সাথে হজ্জ করতাম। কখনো দেখিনি, আসা যাওয়ার সময় তার যবান আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার থেকে বিরত হয়েছে।

৩. আবু আব্দুর রহমান আল-আমরী বলেন: আল্লাহর ব্যাপারে অবহেলা মানে তোমার নিজের প্রতি নিজের গাফলতি। যেমন তুমি আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী একটি বিষয় দেখতে পেলে, অত:পর মাখলুকের ভয়ে কোন আদেশ-নিষেধ না করে তা অতিক্রম করে চলে গেলে।

- যে মাখলুকের ভয়ে আমর বিল মারুফ ছেড়ে দেয়, তার প্রভাব চলে যায়। এরপর সে তার সন্তানকে আদেশ করলেও সন্তান তা হালকা করে দেখে।
- তুমি কিভাবে কল্যাণময় হবে? শায়খ সা'দী রহ: আল্লাহর এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ) "এবং আমাকে করেছেন কল্যাণময়, আমি যেখানেই থাকি না কেন।"

অর্থাৎ যেকোন এলাকায় ও যেকোন যামানায় আল্লাহ আমাদের কল্যাণ ও বরকত রেখেছেন, কল্যাণের শিক্ষাদান, তার প্রতি আহ্বান, অকল্যাণ থেকে বাঁধা দান এবং কথা ও কাজে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করার মধ্যেই। ফলে তখন যে ই তার নিকট বসবে বা তার সাথে মিলিত হবে, সে ই তার বরকত লাভ করবে এবং তার মাধ্যমে তার সাহচর্য গ্রহণকারীগণও সৌভাগ্যবান হবে।

- উপদেশ দানের শর্তাবলী: উপদেশ দানের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় আবশ্যক:

১. আদেশ-নিষেধের পূর্বে ঐ বিষয়ের ইলম থাকা। কাযী আবু ইয়ালা উল্লেখ করেন: একমাত্র সেই ব্যক্তিই সৎকাজের আদেশ বা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে, যে আদেশ-নিষেধকৃত বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর বুঝ রাখে।

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মাঝে কোমলতা অবলম্বন করা। কারণ যেকোন বিষয়ের মধ্যে কোমলতা বিষয়টিকে সৌন্দর্যম-িত করে।

৩. আমল বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকারের পরে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা হযরত লুকমানের তার সন্তানের প্রতি প্রদত্ত উপদেশ বর্ণনা করত: বলেন:

يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمر

"হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় কাজে নিষেধ করো এবং তোমার উপর যে বিপদ আপতিত হয়, তার উপর সবর করো। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

ويؤثرون على أنفسهم

তারা নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়

আল্লামা সা'দী রহ: বলেন: আনসারদের যে বৈশিষ্ট্যটির মাধ্যমে তারা অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছেন, তা হল 'ইছার' তথা অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

এটা হল সর্বোন্নতমানের দানশীলতা। আর তা হল নিজের প্রিয় সম্পদ বা অন্য কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিজের শুধু প্রয়োজন না- বরং প্রচন্ড অভাব ও ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও তা অন্যকে দান করা।

এটা একমাত্র এমন পরিশুদ্ধ অন্তর ও আল্লাহ প্রেমের দ্বারাই হতে পারে, যা প্রবৃত্তির চাহিদা ও তার স্বাদ পুরা করার আগ্রহের উপর বিজয়ী হয়েছে।

তার মধ্যে রয়েছে, জনৈক আনসারি সাহাবীর সেই ঘটনাটি, যার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যিনি তার নিজের ও স্ত্রী-সন্তানের খাবারের উপর মেহমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেরা ক্ষুধা নিয়ে রাত কাটান।

'ইছার' হল 'আছারা (স্বার্থপরতা)'র বিপরীত। তাই ইছার প্রশংসিত, কিন্তু আছারাহ তথা স্বার্থপরতা নিন্দিত। কারণ এটা হল কার্পণ্য ও সংকীর্ণতার বৈশিষ্ট্য।

আর যে ইছারের গুণ লাভ করেছে, নিশ্চয়ই সে মনের লোভ-লালসা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "আর যারা তাদের অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে, তারাই সফল।"

আর স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকলে আল্লাহর সকল হুকুমের ক্ষেত্রেই কার্পণ্যমুক্ত থাকা যায়। কারণ যখন কোন বান্দা স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয়, তখন আল্লাহ ও তার রাসূলের সকল হুকুমের ব্যাপারেই তার মন উদার হবে। সে স্বতস্ফুর্ততা, আনুগত্য ও উদারতার সাথেই তা করবে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় তার প্রিয় ও আকর্ষণীয় হলেও তা বর্জন করতে পারবে।

- সাহাবাদের ভ্রাতৃত্ব ও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দানের কিছু নমুনা:

  রাসূলুল্লাহ সা: এই সত্য ভ্রতৃত্বের বীজ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বপন করেছিলেন। সেদিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন জনৈক আনসারী তার মুহাজির ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: এই রাখলাম আমার সম্পদ, তা আমার ও তোমার মাঝে যৌথ। এই রাখলাম আমার দুনিয়া, তার অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমার। এই যে আমার দুই স্ত্রী, তাদের মধ্য থেকে যে সুন্দর তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, সে তোমার।

  দেখুন, মিসকিনদের বাবা আবু জা'ফর রা: এর অবস্থা: তিনি আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে চললেন খানা খাওয়াতে। অবশেষে সেই পাত্রটিও বের করলেন, যাতে কিছু ছিল না। তিনি সেটা খুললেন। আমরা তার মধ্যে যা ছিল তা চেটে খেলাম।

  আবু হুরায়রা রা: বলেন: হাদিসটি সহীহ বুখারীতে রয়েছে, তিনি বলেন: দানশীলতা হল যা বিদ্যমান আছে তা দান করা। মিসকিনদের জন্য সর্বোত্তম মানুষ হল জা'ফর। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বের হতেন। নিজের সন্তানদের খাবারের উপর রাসূলুল্লাহ সা: এর মেহমানদের অগ্রাধিকার দিতেন।

- তাবিয়ীদের কিছু ভ্রাতৃত্ব ও ইছারের নমুনা: তাবিয়ীদের একজন বড় ইমাম বলেন: আল্লাহর শপথ! যদি পুরো দুনিয়াকে আমার জন্য এক লোকমায় জমা করে দেওয়া হয়, আর আমার এক দ্বীনি ভাই আমার নিকট আসে, তাহলে আমি কোন পরওয়া না করে, তা তার মুখে দিয়ে দিবো।

- ইছার করা (তথা অগ্রাধিকার দেওয়া)র জন্য কিসের প্রয়োজন? ইছার করার জন্য প্রয়োজন একটি কোমল হৃদয়। এমন একটি হৃদয় যাতে অজস্র চিন্তা একত্রিত হলেও সে সবগুলো নিয়েই চিন্তা করে। অবশেষে দু:খ বেদনায় ফেটে পড়ে। প্রয়োজন এমন একটি হৃদয়, যা মুসলমানদের চিন্তা, পেরেশানীর ভার বহনের জন্য সুপ্রশস্ত।
- মনের প্রিয় জিনিসগুলোর উপর আল্লাহর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া: এমনিভাবে আল্লাহর ভালবাসাকে মনের ভালবাসার বস্তুগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন, তাকে প্রবৃত্তির ভালবাসার উপর প্রধান্য দেওয়াও ইছারের জন্য আবশ্যক। সুতরাং ইছার দু'টি জিনিসের দাবি করে:

  ১. আল্লাহ যা ভালবাসেন তা করা, যদিও মন তা অপছন্দ করে। কখনো মন কোন একপ্রকার ইবাদতকে অপছন্দ করে, যেমন ধরুন, তার মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা বা অলসতা আছে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত ইছার হবে নিজের অপছন্দের উপর আল্লাহর ভালবাসাকে প্রাধ্যান্য দেওয়া।

  ২. ইছারের দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তা বর্জন করা, যদিও তোমার মন তা পছন্দ করে ও ভালবাসে।

এ দু'টি জিনিসের মাধ্যমে সঠিক ইছার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে মুমিন আল্লাহর ভালবাসার স্তরে পৌঁছতে চায় এবং আল্লাহর ভালবাসা নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চায়, তাকে আরও কষ্ট করতে হবে এবং দুর্বল মনকে শায়েস্ত করতে হবে, যাতে এই স্তরে পৌঁছতে পারে এবং এরকম ইছার বাস্তবায়ন করতে পারে। তাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, মহা সফলতা লাভ করার জন্য এবং উচ্চ মেহনত ও ভয়াবহ বিপদ সহ্য করার জন্য কোমড় বাঁধতে হবে।

- ইছারের মাধ্যমগুলো:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং শুধু তার জন্যই আমল করা: যখন বান্দা কোনরূপ অলসতা ব্যতীত মনে প্রাণে আল্লাহর দিকে এগুতে চায়, যখন সে আখেরাতের দিকে দৌঁড়ায়, তখন সে নেক আমল ও ঈমান অর্জনকারী ইবাদতে কোন বিরতি দেয় না।

২. দয়া ও নম্রতা: দয়া ছাড়া কোন ইছার হয় না। একারণে কোন মানুষের অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত নম্র, কোমল ও দয়াশীল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য ইছারকারী হওয়া সম্ভব নয়। যখন আল্লাহ কাউকে কঠোর হৃদয় থেকে মুক্তির মাধ্যমে দয়া করেন, ফলে তার অন্তর অপরের জন্য দু:খ বেদনায় ফেটে পড়ে, তখন এই দয়ার মাধ্যমেই সে ইছার করতে পারে। যেটাকে আল্লাহ রহমত বলে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে অন্তর নরম হওয়া।

তাই যার অন্তর কঠিন, সে তো ইছার থেকে অনেক দূরে: কঠিন হৃদয়ের অধিকারী তার অন্তরে ইছারের কোন পথ বা প্রমাণই খুজে পায় না।

কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নরম-কোমল অন্তর দান করেন, তখন সে মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া থেকে নিজে বিরত থাকে ও অন্যদেরকে বিরত রাখে এবং এমন ব্যক্তি আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে উপকার করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

৩. মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ: এটা হল ইছারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এটাই অন্য মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাদের প্রতি সর্বপ্রকার কল্যাণ পৌঁছাতে উৎসাহিত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

৪. বান্দার একথা স্মরণ করা যে, সে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে: সে যখন এটা স্মরণ করবে, তখন তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে আর পরকালীন ভবিষ্যৎ

বড় হবে। সে মৃত্যু ও তার যন্ত্রণার কথা চিন্তা করবে, কবর ও তার শয্যার কথা চিন্তা করবে।

- আল্লাহর প্রশংসা করা:

আমাদের প্রভুর সঙ্গে আমাদের মুনাজাতে, দু'আয় ও সারা জীবনে আমাদের একটি ত্রুটি হল আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কম করি, তার বড়ত্ব, মহত্ব ও পবিত্রতা কম বর্ণনা করি। অথচ তিনি আমদেরকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী কত নেয়ামত দান করেছেন, যা গণনা ও অনুমানের বাইরে।

- একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত: যদি এক ব্যক্তি তোমাকে প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করে, তার জন্য তোমার সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিভিন্ন মজলিসে অত্যধিক প্রশংসার অবস্থা কেমন হবে?! অথচ আল্লাহর জন্যই সর্বোচ্চ সম্মান। আমরা আমাদের প্রত্যহিক জীবনের একটি মুহূর্তও তার থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবো না। তাহলে কি এই মহান অনুগ্রশীল, দয়াশীল, দানবীর, রিযিকদাতা এবং বহু সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী রব দিবা-রাত্রি, সর্বস্থানে ও সকল অবস্থায় প্রশংসা ও সম্মান পাবার উপযুক্ত নন?!
- কুরআনে আল্লাহর প্রশংসা: আমরা যদি কুরআন যথাযথভাবে অনুধাবন করি, তাহলে দেখতে পাবো, পুরো কুরআনই আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা, তার নাম, গুণাবলী, কুদরত ও মহত্বের ব্যাপারেই আলোচনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহকে তার যথোচিত মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়মাতের দিন সমগ্র পৃথিবী তার মুঠোর ভিতরে থাকবে এবং আকাশম-লী গুটানো অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। তিনি পবিত্র। তারা যে শিরক করে, তিনি তা থেকে বহু উর্ধ্বে।"

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক আয়াতে নিজেই তার পবিত্র ও বরকতময় সত্ত্বার পরিচয় তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দেখুন:

- (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

"বল, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।"

- (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তাই তেমারা সেগুলোর মাধ্যমে তাকে ডাক।"

- (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

"আকাশম-লী ও যমীনের অস্তিত্তদাতা। তিনি যখন কোনও বিষয়ের ফায়সালা করেন, তখন কেবল এতটুকু বলেন যে, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।"

- (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

"আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"

- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ক্ষতিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অভ্যন্তর। তিনি প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে অবগত।

- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তার মত কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আকাশম-লী ও যমীনের যাতীয় চাবি তারই কর্তৃত্বে। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকোচিত করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে অবগত।”

– (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ)

(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, এই পৃথিবী এবং যারা এতে বাস করছে তারা কার মালিকানায়, যদি তোমরা জান? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল কে সাত আকাশের মালিক এবং মহা আরশের মালিক? তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? বল, কে তিনি, যার হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না? বল, যদি জান? তারা অবশ্যই বলবে (সমস্ত কর্তৃত্ব) আল্লাহর। বল, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছো?

- (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

কল্যাণময় সেই সত্তা, যার হতে সমস্ত রাজত্ব। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।

– (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি বাদশা, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষ-ত্রুটির সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত। তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তারই, আকাশম-লী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তারই তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক।

এছাড়াও রয়েছে কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত, আয়াতুল কুরসী। যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহর প্রশংসা।

তিনি নিজের বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করেন: তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী, সকল দয়াশীলদের শ্রেষ্ঠ দয়াশীল, সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল, সর্বোত্তম বিচারক, সর্বোত্তম রিযিকদাতা, সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ মিমাংসাকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।

- হাদিসে আল্লাহর প্রশংসা: রাসূলুল্লাহ সা: বলেন: আল্লাহ হতে অধিক প্রশংসাপ্রিয় কেউ নেই। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখার ও মুসলিম)

ইমাম নববী রহ: বলেন: প্রকৃতপক্ষে এতে বান্দারই উপকার। কারণ তারা আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দান করেন, ফলে তারা উপকৃত হয়। আর আল্লাহ তা’আলা জগতবাসী থেকে অমুখাপেক্ষী। তাদের প্রশংসা তার কোন উপকার আসে না, আর তাদের নিন্দাও তার কোন ক্ষতি করে না। এই হাদিসে আল্লাহর প্রশংসা, তাবসীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ও সকল প্রকার যিকরের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নবী সা: বলেন: اَلِظُّوا بِيَا ذَا الجَلال والإِكرام “সর্বদা ইয়া জালজালালে ওয়াল ইকরাম বলতে থাকো।” অর্থাৎ সর্বদা বেশি বেশি বল এবং তোমাদের দু’আর মধ্যে তা উচ্চারণ কর।

জনৈক গ্রাম্য লোক নবী সা: এর নিকট এসে বলল: আমাকে কিছু দু'আ শিক্ষা দিন, যাতে আমি পড়তে পারি। নবী সা: বললেন: বল-

لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم

"আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। আল্লাহ মহান। অফুরন্ত প্রশংসা তার জন্য। তিনি পবিত্র। জগতসমূহের প্রতিপালক। পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত সাহায্য বা শক্তির কোন উৎস নেই।" লোকটি বলল: এগুলো তো আমার রবের জন্য, তাহলে আমার জন্য কি? তখন রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: বল- اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে পথপ্রদর্শন করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

এই হাদিসে শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা আর শেষে নিজের জন্য দু'আ।

- বিপদের দু'আ:

لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি আকাশম-লীর রব, পৃথিবীর রব এবং সম্মানিত আরশের রব (বুখারী মুসলিম)

- নামাযে আল্লাহর প্রশংসাগুলোর ব্যাপারে চিন্তা কর:

যা নামাযের নিম্নোল্লেখিত কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. নামাযের তাহরীমা বাঁধার তাকবীর ও এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার তাকবীর: যখন বল, আল্লাহু আকবার, তাতে আল্লাহর মহত্ব এবং সবকিছু থেকে তার বড় হওয়ার কথা রয়েছে।

২. নামায শুরুর দু'আ:

سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك

"হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময়। তোমার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে এবং তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

تعالى جدك মানে হচ্ছে তোমার মর্যাদা, মহত্ব ও ক্ষমতা সুউচ্চ।

৩. 'আউযু বিল্লাহ'। অথাৎ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। মানুষ তো একমাত্র তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাকে সে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশীল মনে করে।

৪. বিসমিল্লাহ। এখানে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা, তার উপর ভরসা এবং তার রহমান (পরম দয়ালু) ও রহীম (সীমাহীন মেহেরবান) নামের উল্লেখ রয়েছে।

৫. ফাতিহা। তার প্রথম তিনটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা, ও গুণকীর্তন রয়েছে। যা হচ্ছে- (الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি সীমাহীন দয়ালু, বড়ই মেহেরবান। বিচার দিবসের মালিক।"

৬. রুকুর যিকরসমূহ:

سبحان ربي العظيم "আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"

سبّوح , قدوس , رب الملائكة والروح "তিনি পবিত্র, ফেরেশতা ও রূহের রব।

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي "হে আল্লাহ, হে আমাদের রব! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও"

سبحان ذي الجبروت , والملكوت , والكبرياء , والعظمة "পরাক্রম, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

৭. রুকু থেকে উঠার দু'আসমূহ:

سمع الله لمن حمده "যে আল্লাহর প্রশংসা করছে, আল্লাহ তা শুনছেন।

ربنا ولك الحمد , حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه "হে আমাদের রব! তোমার অফুরন্ত প্রশংসা করছি, উত্তম ও বরকমতয় প্রশংসা।"

ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما , وملء ما شئت من شيء بعده . أهل الثناء والمجد , أحق ما قال العبد , وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد

আকাশম-লীর সমপরিমাণ, পৃথিবীর সমপরিমাণ ও এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সমপরিমাণ এবং এছাড়াও আপনি যা চান তার সমপরিমাণ। প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যা বলেছে, তার সর্বাধিক উপযুক্ত সত্তা। আর আমরা সবাই তোমার দাস। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা ঠেকাবার কেউ নেই আর তুমি যা ঠেকাও তা দান করার কেউ নেই। তোমার শক্তির বাইরে কোন প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা উপকারে আসবে না।

৮. সিজদার দু'আ সমূহ:

سبحان ربي الأعلى "আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي "হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। হে আমাদের রব! হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।

سبوح , قدوس , رب الملائكة والروح "তিনি পবিত্র, ফেরেশতা ও রূহের রব।"

اللهم لك سجدت وبك آمنت , ولك أسلمت , سجد وجهي للذي خلقه , وصوره , وشق سمعه وبصره , تبارك الله أحسن الخالقين

"হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদাহ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা সেই সত্তার জন্য সেজদাহ করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার আকৃতি দান করেছেন এবং তার কর্ণ ও চক্ষু ফেড়েছেন। আল্লাহ বরকতময়। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী।'

سبحان ذي الجبروت , والملكوت , والكبرياء , والعظمة "পরাক্রম, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

৯. তাশাহহুদ:

التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

সমস্ত শান্তি, রহমত ও কল্যাণ আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত। সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর সকল নেককার বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসূল।

ইমাম নববী রহ: বলেন: التحيات এর অর্থ কেউ বলেন: রাজত্ব, কেউ বলেন: স্থায়িত্ব, কেউ বলেন: সম্মান, কেউ বলেন: জীবন।

১০. দরূদে ইবরাহিমির শেষাংশে রয়েছে- إنك حميدُ مجيد "নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাময়"। এখানে আল্লাহর অফুরন্ত প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাহলে তুমি নামাযে তোমার অন্তর, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করছো। তাই এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবে। ঐ সকল উদাস ও অসাড় লোকদের মত হবে না, যারা নামাযের মধ্যে কি বলছে, তা নিজেও জানে না। যারা এ সমস্ত যিকর ও দু'আগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করে না।

- সালাম পরবর্তী আল্লাহর প্রশংসাসমূহ:

কেউ এগুলো যথাযথভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবে, তাতে শুধু আল্লাহর প্রশংসাই প্রশংসা!

أستغفر الله (ثلاثا) اللهم أنت السلام , ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير – , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد

لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد وهو على كل شيء – قدير . لا حول ولا قوة إلا بالله , لا إله إلا الله , ولا نعبد إلا إياه , له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن , لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

سبحان الله , والحمد لله , والله أكبر (ثلاثا وثلاثين) لا إله إلا الله وحده لا – شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير [.]قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين.

‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ তথা আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি...(তিনবার)। হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই শান্তি। হে পরাক্রম ও মর্যাদার অধিকারী! তুমি বরকতময়।

আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসা শুধু তারই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা ঠেকাবার কেউ নেই আর তুমি যা ঠেকাও তা দান করার কেউ নেই। আর তোমার শক্তির বাইরে কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকারে আসে না।

আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসা শুধু তারই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি ও সাহায্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। নেয়ামত ও অনুগ্রহ তারই। তারই জন্য উত্তম প্রশংসা। আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই আনুগত্য পূর্বক স্বীকার করছি যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যদিও তা কাফেররা অপছন্দ করুক না কেন।

সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। (তেত্রিশবার করে।)

আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসা শুধু তারই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

আয়াতুল কুরসী। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

- সকাল-সন্ধার যিকরগুলোতে আল্লাহর প্রশংসা দেখুন:

সকাল-সন্ধার যিকরগুলোতে আল্লাহর প্রশংসা, সম্মান ও বড়ত্ব প্রকাশক অনেক দু’আ ও যিকর রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন:

- سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله أنت , خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي ,, وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

– اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك , فلك الحمد ولك الشكر.

– حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (سبع مرات).

– سبحان الله وبحمده (مائة مرة).

– لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (مائة مرة إذا أصبح).

– اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض , رب كل شيء ومليكه , أشهد أن لا إله إلا أنت , أعوذ بك من شر نفسي , ومن شر الشيطان وشركه , وأن أقترف على نفسي سوءا , أو أجره إلى مسلم [، وإلى غير ذلك من أذكار الصباح والمساء.

সায়্যিদুল ইস্তেগফার: হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমর বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার উপর থাকবো। আমি আমার মন্দ কৃতকর্মসমূহ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করছি, যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছো। আমি আমার গুনাহসমূহের কারণেও তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তাই তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া তো ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

হে আল্লাহ! এই সকাল বেলা আমার উপর এবং তোমার প্রতিটি সৃষ্টির উপর যত নেয়ামত এসেছে, তা কেবল তোমার থেকেই। তোমার সাথে কোন শরীক নেই। আর কৃতজ্ঞতা তোমারই জ্ঞাপন করছি।

আমার জন্যই আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি, তিনিই মহান আরশের রব। (সাত বার

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি) (একশত বার)

আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসা শুধু তারই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (সকাল বেলা একশত বার)

হে আল্লাহ! দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের ইলমের অধিকারী! আসমান-যমীন সৃষ্টিকারী! প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের অন্তরের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক থেকে এবং আমার নিজেকে কোন অকল্যাণে লিপ্ত করা থেকে বা কোন মুসলিমের প্রতি তা টেনে আনা থেকে।

সকাল-সন্ধার এজাতীয় আরও অনেক যিকর রয়েছে।

- ঘুমের পূর্বের যিকরগুলোতে আল্লাহর প্রশংসার কথাগুলো চিন্তা করুন:
  - আয়াতুল কুরসী।

اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض , ورب العرش العظيم , ربنا ورب كل شيء , فالق الحب والنوى , ومنزل التوراة والإنجيل , والفرقان , أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء , وأنت الآخر

فليس بعدك شيء , وأنت الظاهر فليس فوقك شيء , وأنت الباطن فليس دونك شيء , اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

“হে আল্লাহ! সপ্তাকাশ ও পৃথিবীর রব, মহান আরশের রব, আমদের ও প্রতিটি সৃষ্টির রব, (বীজের) দানা ও খোসা বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! তোমার হাতে যাদের ভাগ্য এমন প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কোন কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই বিজয়ী, তোমার উপরে কেউ নেই। তুমিই অভ্যন্তরে, তোমার নীচে কেউ নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও, আমাদেরকে দারীদ্র্য থেকে মুক্ত কর।”

- সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশ বার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার।

- আমরা আল্লাহর প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারব না:

রাসূলুল্লাহ সা: এর সেজদার একটি দু'আ ছিল এই:

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

“হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে এবং তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারব না, তুমি সেই রূপই, যেরূপ তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছো।”

ইমাম মালেক রহ: বলেন: لا أحصى ثناء عليك এর অর্থ হল: আমরা যদি তোমার প্রশংসায় খুব পরিশ্রমও করি, তথাপি তোমার নেয়ামত, অনুগ্রহ ও তার যথোচিত প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারবো না।

- আপনি কি জানেন, নিম্নোক্ত কথাগুলো বলাও আল্লাহর প্রশংসা:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।

لا حول ولا قوة إلا بالله আল্লাহর সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত কোন সাহায্য ও শক্তি নেই।

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তার জন্য, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহই সবচেয়ে বড়।

- তোমার অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নাও:

১. তুমি জানবে এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, যিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক, সৃষ্টির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিই আল্লাহ, তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। তাই আসমান-যমীনে ছোট-বড় যত সৃষ্টি আছে সকলেই আল্লাহর দাস, তার প্রতি মুখাপেক্ষী। তারা নিজেদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। তারা জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থানের ক্ষমতাও রাখে না। তাই একমাত্র আল্লাহই তাদের সকলের মালিক। তারা তার প্রতি মুখাপেক্ষী, তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি পবিত্র।

২. তুমি আরও জানবে ও বিশ্বাস করবে যে, সমস্ত কিছুর ভান্ডার এককভাবে আল্লাহর নিকট। অন্য কারো নিকট নয়। তাই দুনিয়াতে যত কিছু আছে তার মূল

ভা-ার আল্লাহর নিকট। খ্যাদ্য, পানীয়, পানি, বাতাস, ধন-সম্পদ, সমুদ্র ও অন্যান্য সকল জিনিস আল্লাহর নিকট রয়েছে। তাই আমাদের যত কিছুর প্রয়োজন হবে, আমরা তা আল্লাহর নিকট চাইবো, তার বেশি বেশি ইবাদত ও আনুগত্য করবো। তিনিই সমস্ত প্রয়োজন পুরাকারী এবং আহ্বানে সাড়াদানকারী। তিনিই সর্বোত্তম প্রার্থনাস্থল ও সর্বোত্তম দানকারী। তিনি যা দেন, তা রোধকারী কেউ নেই এবং তিনি যা রোধ করেন, তা দানকারী কেউ নেই।

৩. তুমি একথাও জানবে ও বিশ্বাস করবে যে, একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য, তার সাথে কোন শরীক নেই। এককভাবে তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তাই তিনিই জগতবাসীর প্রতিপালক ও উপাস্য। আমরা পরিপূর্ণ বিনয়, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে তার বিধিবদ্ধ বিধানাবলী মান্য করত: তারই ইবাদত করবো। সুতরাং অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করবে না, একমাত্র তার নিকটই প্রার্থনা করবে। অন্য কারো নিকট সাহায্য চাইবে না, একমাত্র তারই নিকট সাহায্য চাইবে। অন্য কারো উপর ভরসা করবে না, একমাত্র তার উপরই ভরসা করবে। অন্য কাউকে ভয় করবে না, একমাত্র তাকেই ভয় করবে। অন্য কারো ইবাদত করবে না, একমাত্র তারই ইবাদত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তাই তোমরা তারই ইবাদত করো। তিনিই প্রতিটি জিনিসের উপর নিয়ন্ত্রক।

দেখ, চিন্তা কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে একজন মুসলিম তার প্রতিটি দিনে এবং পুরো জীবনে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত প্রতিটি অবস্থায় ও প্রতিটি কাজে আল্লাহর সুন্দর নাম, উন্নত গুণাবলী এবং অগণিত ও অসংখ্য নেয়ামতরাজী উল্লেখ পূর্বক তার প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করছে।

এই যে বাক্যগুলো, যিকর ও দু'আগুলো, প্রতিদিন বার বার পাঠ করছো: তুমি কি তার ব্যাপারে চিন্তা করছো, নাকি অবচেতনভাবে শুধু বলে যাচ্ছো?

- কিভাবে তুমি দীর্ঘ সিজদাহ করবে?

দীর্ঘ সিজদাহ আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা এবং তার সঙ্গে মুনাজাত ও ঘনিষ্টতার স্বাদ প্রাপ্তির ইঙ্গিত করে। আর এর বিপরীতটা বিপরীতটার ইঙ্গিত করে।

সহীহুল বুখারীতে আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ সা: এগার রাকাত নামায পড়তেন। ঐ নামাযগুলোতে তিনি এতটুকু দীর্ঘ সিজদাহ করতেন যে, তার মাথা উঠানোর পূর্বেই তোমরা পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারবে।

রাসূলুল্লাহ সা: আমাদেরকে সিজদাহ দীর্ঘ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: বান্দা তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় সিজদাবস্থায়। তাই তোমরা (সিজদার মধ্যে) বেশি বেশি দু'আ কর। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

এটি একটি দামি ও সোনালী সুযোগ: দুর্বল অযোগ্য ও গুনাহগার বান্দা এই অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। তাই তোমার উচিত সিজদাহ দীর্ঘ করা এবং সকল প্রয়োজন পুরাকারী, আহ্বানে সাড়াদানকারী, সর্বোত্তম প্রার্থনাস্থল ও সর্বোত্তম দানকারী আল্লাহর নিকট বেশি পরিমাণে দু'আ ও মিনতি করা এবং তোমার দু:খ, ব্যাথা ও অভিযোগগুলো খুলে বলা।

- সিজদাহ দীর্ঘ করার কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ: দু'আ করার সময় কিছু বিষয় দায়িকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সিজদাহ দীর্ঘ হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাত, ঘনিষ্ঠতা এবং দীনতা ও মুখাপেক্ষীতা প্রকাশের স্বাদ লাভ করা যায়। উক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. দু'আ করার সময় আল্লাহর প্রশংসার কথা স্মরণ করা। আমরা পূর্বের আলোচনায় আল্লাহর প্রশংসার ব্যাপারে আলোচনা করেছি। অনেক মানুষ আছে, দু'আর মধ্যে তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী প্রয়োজনাদীর কথায় ব্যস্ত থাকে, কিন্তু এটা অনুধাবনও করে না যে, তার দু'আর বিরাট একটি অংশ দখল করে আছে আল্লাহর প্রশংসা। উলামায়ে কেরাম এও উল্লেখ করেছেন যে, দু'আ কবুলের মাধ্যমগুলোর

মধ্যে একটি হল আল্লাহর প্রশংসা করা ও তার মর্যাদা বর্ণনা করা এবং দু'আর মধ্যে আল্লাহর দীর্ঘ প্রশংসা করতে বিরক্ত বা ক্লান্ত না হওয়া। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে অগণিত নেয়ামতের মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন।

২. দু'আর মধ্যে তোমার পূর্বের বর্তমানের গুনাহগুলো স্মরণ করা এবং ভবিষ্যতে তাতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আশংকা করা। অত:পর আল্লাহর নিকট দু'আ করা যেন আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, নবী সা: দু'আ করেছেন: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কৃত অন্যায় কর্ম থেকে এবং যেগুলো এখনো করিনি, তা থেকে পানাহ চাই।" মুহাদ্দিসগণ বলেন: এর অর্থ হল, যে সমস্ত গুনাহ আমি করে ফেলেছি, যেগুলো দুনিয়াতেই শাস্তির দাবি করে অথবা আখেরাতে শাস্তি দাবি করে, যদিও বা আমি তার ইচ্ছা করেনি, সেগুলোও ক্ষমা করে দাও।

রাসূলুল্লাহ সা: থেকে আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি এই দু'আ করতেন: اللهم اغفر لي ذنبي كله , دقه وجله , وأوله وآخره وعلانيته وسره হে আল্লাহ! আমি ছোট-বড়, শুরুতে-শেষে, প্রকাশ্যে-গোপনে যত গুনাহ করেছি, সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

৩. দু'আর মধ্যে কুরআনে বর্ণিত দু'আগুলো করবে। যেমন: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا "হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান কর আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও" (দেখুন, কাহতানীর ছোট্ট দু'আর কিতাবটি)

৪. দু'আর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সা: যেসকল ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করেছেন, সেগুলো দিয়ে দু'আ করবে। যেমন:

اللهم إني أسألك من الخير كله : عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم . اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك . اللهم إني أسألك الجنة ، وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নগদ, বিলম্বিত, জানা-অজানা সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট তাৎক্ষণিক বা পরবর্তী জানা অজানা সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সেই বস্তু কামনা করছি, যা তোমার বান্দা ও তোমার নবী তোমার নিকট প্রার্থনা করেছে এবং আমি তোমার নিকট সেই বস্তু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা থেকে তোমার নবী তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত ও যে সকল কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করবে, তার তাওফীক প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও যেসকল বিষয় জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে, তা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আর আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার জন্য সকল কল্যাণের ফায়সালা কর।

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر

হে আল্লাহ! আমাকে এমন দ্বীনদারী দান কর, যা আমার একমাত্র রক্ষাকবচ। আমার জন্য আমার দুনিয়ার সুব্যবস্থা করে দাও, যার দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করবো। আমার জন্য আমার আখেরাত সংশোধন করে দাও, যা আমার

প্রত্যাবর্তনস্থল। আমার বেঁচে থাকাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ বৃদ্ধিকারী বানাও। আর আমার মৃত্যুকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে প্রশান্তি স্বরূপ বানাও।

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর, আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت

হে চিরঞ্জীব, সদা প্রতিষ্ঠিত! তোমারই রহমতের আশ্রয় চাই। আমার জন্য আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের দায়িত্বে সপে দিও না। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

এই দু’আগুলো তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চাহিদাগুলোকেই অন্তর্ভূক্ত করেছে। তাই এগুলোই হল ব্যাপক, পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্তকারী। তাই এগুলোর প্রতি যতœবান হও। সর্বদা তোমার দু’আর মধ্যে এগুলো বারবার পড়তে থাক। তাহলেই তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারবে।

৫. তোমার অন্তর ও নিয়্যতের অবস্থা স্মরণ করবে, অত:পর সর্বদা আল্লাহর নিকট দু’আ করবে, যেন আল্লাহ তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেন। তাকে রিয়া (লোক দেখানো), বিদ্বেষ, অহংকার, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে পবিত্র করেন এবং তোমার নিয়্যত সঠিক করে দেন। ফলে তুমি একমাত্র আল্লাহর জন্যই আমল করতে পার। দুনিয়া উপার্জনার জন্য, প্রশংসা কুড়ানোর জন্য বা পদ লাভের জন্য আমল না কর।

“রাসূলুল্লাহ সা: একটি দু’আ করতেন: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك হে আল্লাহ! অন্তরসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরাও”। আরও বলতেন: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরগুলোকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখ।

কারণ আল্লাহর নিকট মানুষের মূল্য তার অন্তরের পবিত্রতা, সচ্ছতা, নিষ্ঠা ও সততার ভিত্তিতে।

৬. তোমার নিপীড়িত ও বন্দী ভাইদের কথা স্মরণ করবে, তারপর তাদের জন্য দু’আ করবে, যেন আল্লাহ তাদেরকে সকল পেরেশানী থেকে মুক্তি দান করেন, সকল সংকট থেকে উত্তরণ করেন, তাদের অন্তরকে দৃঢ় করে দেন এবং তাদের একাকিত্বের সঙ্গী হন।

নবী সা: বলেছেন: কোন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে দু’আ করলে তা কবুল হয়। তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দু’আ করে, তখন উক্ত নিযুক্ত ফেরেশতা বলে: আমীন! আল্লাহর তোমার জন্যও এমনটা কবুল করুন! (সহীহ মুসলিম)

আর যে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে দু’আ করে, সে তার চেতনায় ও অনুভূতিতে উন্নতি অনুভব করবে। কারণ এই ব্যক্তি শুধু তার ব্যক্তিকে নিয়েই চিন্তা করে না, বরং সমস্ত মুসলিমদেরকে নিয়ে চিন্তা করে।

৭. আল্লাহর নিকট জান্নাতের উচ্চস্তর লাভের জন্য দু’আ করবে। রাসূল সা: বলেন: জান্নাতে ১০০ টি মর্যাদার স্তর রয়েছে। যা আল্লাহ তার পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-যমীন দূরত্ব। তাই তোমরা যখন আল্লাহর নিকট দু’আ করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের দু’আ করবে। কারণ

এটাই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এর উপর হল দয়মায়ের আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী)

হে ভাই! তোমার বেশি আমল ও বেশি ইবাদতের উপর ভরসা করো না। এটার দিকে লক্ষ্যও করো না। বরং আল্লাহর ব্যাপক রহমত, উদারতা, অনুগ্রহ, দানশীলতা ও ইহসানের কথা স্মরণ করো। কারণ তিনিই পরম দয়ালু, উদার, দানশীল ও মহা অনুগ্রহকারী।

৮. দু'আ তিনবার করে করবে। রাসূলুল্লাহ সা: যখন দু'আ করতেন, তিনবার করে করতেন। কোন কিছু চাইলে তিনবার করে চাইতেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

এতে বুঝা গেল, দু'আ তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করা পছন্দনীয়।

দু'আ পুনরাবৃত্তি করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহর নিকট যা আছে, তার প্রতি তোমার আগ্রহ, আশা ও লোভ অনেক বেশি। আর আল্লাহ তা'আলা তার নেয়ামতরাজীর ব্যাপারে বান্দার দৃঢ় আশাকে ভালবাসেন।

৯. তোমার মুসলিম ভাইদের জন্য ক্ষমার দু'আ করবে। হাদিসের মধ্যে নবী সা: থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: যে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষ থেকে তার জন্য একটি করে সওয়াব লিখেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবারানী।)

এতে তাদের জন্য বিরাট পুরস্কারের কথা বলা হল, যারা জীবিত-মৃত সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাহলে এটা যদি তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে সওয়াব কেমন হতে পারে!? কতজনের পক্ষ থেকে তার নেক লাভ হতে পারে.......?!

জ্ঞাতব্য: প্রিয় ভাই! আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের একটি প্রকার হল: তাদের জন্য দু'আ করা। তাই সর্বদা তাদের জন্য দু'আ করতে ভুলবে না। অনেক দু'আকারীই এ বিষয়টিতে উদাস।

১০. নবী সা: যে সমস্ত বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতেন, তুমিও সেসকল বিষয় থেকে আশ্রয় কামনা করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সা: দু'আ করতেন:

اللهم إني أعوذ بك من العجز ، والكسل ، والجبن ، والبخل ، والهرم ، وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها . أنت وليها ومولاها . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কার্পণ্য, বার্ধক্য ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার নফসকে তার উপযুক্ত তাকওয়া দান কর এবং তাকে পরিশুদ্ধ কর। তুমিই তো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও দায়িত্বশীল। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে, যা উপকৃত করে না, এমন অন্তর থেকে, যা ভয় করে না, এমন নফস থেকে, যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ হতে, যা গৃহিত হয় না।

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার নিয়মাতের পরিসমাপ্তি, তোমার নিরাপত্তার বিলুপ্তি, তোমার আকস্মিক শাস্তি এবং তোমার সর্বপ্রকার ক্রোধ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلبي ، ومن شر منيي

হে আল্লাহ! আমি আমার কানের অনিষ্ট থেকে, আমার চোখের অনিষ্ট থেকে, আমার যবানের অনিষ্ট থেকে, আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ، والأعمال ، والأهواء

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মন্দ চরিত্র, মন্দ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

- সর্বদা স্মরণ রাখবে:

আবুদ দারদা রা: বলেন: যে বেশি বেশি দরজায় করাঘাত করে, তার জন্যই দরজায় খোলা হয়। আর যে বেশি বেশি দু'আ করে, তার দু'আই কবুল করা হয়।

- পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন থাক:

কিছু কিছু মানুষ যখন তার দু'আ কবুলের কোন আলামত দেখতে না পায়, তখন সে তার প্রভুর উপর রাগান্বিত হয়। কিন্তু নিজের উপর ও নিজের গুনাহসমূহের উপর রাগান্বিত হয় না, যা তার দু'আ কবুল হতে বাঁধা দেয়।

- দু'আকারী সর্ববস্থায়ই লাভবান: জেনে রাখ, দু'আর ফল নিশ্চিত। কারণ নবী সা: বলেছেন: যেকোন মুসলিম দু'আ করুক, যদি তা কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারে না হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে তিনটির যেকোন একটি প্রতিদান দেনই। হয়ত নগদই তার দু'আ কবুল করেন, অথবা এটা তার আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা তাকে অনুরূপ একটি মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করেন। একজন বলল: তাহলে তো আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো? তিনি বললেন: আল্লাহ তার চেয়েও অধিক দানকারী।

- এক স্নেহশীলের উপদেশ: দু’আর মধ্যে সর্বদা বারবার এগুলো বলবে: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।

لا حول ولا قوة إلا بالله আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি ও সাহায্য নেই।

এগুলো দু’আ কবুলের সবচেয়ে বড় মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভূক্ত।

আপনার মুজাহিদ ভাইদের জন্য দু’আর আবেদন রইল।